বিশ্বভাণ্ডার সাহিত্য-সিরিজের দ্বিতীয় গ্রন্থ

অদৃষ্টের পত্র

(গল্প পুস্তক)

শ্রীকালীকৃষ্ণ সিদ্ধান্তশাস্ত্রী

প্রণীত

প্রকাশক—

প্রফেসার শ্রীযতীন্দ্রকিশোর চৌধুরী, এম, এ,

২১৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য ১৲ এক টাকা

Printed at the
Biswabhandar Press,
216, Cornwallis Street,
Calcutta.

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ

দেবতার দান	(গল্পপুস্তক)	১৷০
পতিত আশ্রম	(যন্ত্রস্থ)	
মুক্তি-মন্দির	(যন্ত্রস্থ)	
অমৃতপথের যাত্রী	(যন্ত্রস্থ)	
দীনের কণ্ঠ	(যন্ত্রস্থ)	

প্রাপ্তিস্থান—

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩৷১৷১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
কমলা বুক ডিপো, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।
বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
রাজলক্ষ্মী পুস্তকালয়, ২১৬, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ও প্রকাশকের নিকট—

উপহার

এই গ্রন্থখানি

আমার

প্রদত্ত হইল।

তারিখ ——————

শ্রী ——————

শ্রীশ্রীদুর্গা।

পরম কল্যাণীয়া—

শ্রীমতী বীণাপাণি চৌধুরাণী আঠারবাড়ী ময়মনসিংহ।

সাবিত্রী প্রতিমাসু—

মা,—

তুমি যে গৃহের লক্ষ্মী, আনন্দ ও প্রতিষ্ঠা, সেই গৃহের সহিত আমার অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সেই সম্পর্কের অধিকারে আজি নববর্ষের প্রথম প্রভাতে অকৃত্রিম স্নেহ ও আশীর্ব্বাদের সহিত **"অনূঢ়ার পত্র"** খানি তোমার হাতে দিলাম। তুমি জান, বাংলার ঘরে ঘরে কি দুর্নীতি প্রবেশ লাভ করিয়াছে,—তাহার ফলে দেশের জননী ও ভগিনীর জাতিকে কতটা না নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইতেছে; অথচ আশ্চর্য্য এই যে, এই দুর্নীতি দূর করা যাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য, তাঁহারাই অনেক ক্ষেত্রে ইহার প্রশ্রয় দান করিতেছেন!

মহাশক্তির অংশ নারী, যতক্ষণ নিজের মর্য্যাদা নিজে না বুঝিবেন—ততক্ষণ বাংলার এই দুর্নীতির প্রশমন হইবে না,—মা, তুমি তোমার নিজের অনুভূতিদ্বারা বাংলার নারীসমাজের অনুভূতি জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিলেই আমার পরিশ্রম সার্থক হইবে।—

১৩৩২ সন ১লা বৈশাখ।
আঠারবাড়ী
ময়মনসিংহ।

নিয়তাশীর্ব্বাদক,—
শ্রীকালীকৃষ্ণ শর্ম্মা।

গ্রন্থকারের নিবেদন।

'দেবতার দান' ও 'অনূঢ়ার পত্র' মুদ্রিত হইল। বাংলাদেশে গল্প উপন্যাস প্রভৃতির অভাব নাই। দেশের অধিকাংশ পাঠক পাঠিকা গল্প উপন্যাস প্রভৃতিই প্রধানতঃ পাঠ করেন, তাই বড় বড় মাসিক কাগজেও তথাকথিত গল্প ও উপন্যাসের পসার অত্যন্ত বেশি, আরও কিছুকাল ইহার অবাধগতি রুদ্ধ হইবে না।

ইহার ফল ভাল কি মন্দ, ভবিষ্যৎ তাহার বিচার ভার লইবে। বর্ত্তমানে ভাল এই যে, সাধারণের মধ্যে পাঠপ্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিতেছে—ফলে সাহিত্যের চর্চ্চা বৃদ্ধি পাইতেছে; আর মন্দ এই যে, এই শ্রেণীর লঘু-সাহিত্যের বহুল প্রচারে সাধারণের পাঠপ্রবৃত্তি গুরুতর বিষয়ে বিমুখ হইয়া পড়িতেছে; এবং তাহার ফলে দেশে যে সকল অতি আবশ্যক চর্চ্চা জাতির কল্যাণকরী, তাহার পসার তেমন বাড়িয়া উঠিতেছেনা। আরও মন্দ এই যে গল্প ও উপন্যাসের তথাকথিত ইব্‌সেনী ধারা বাংলার ঘরে ঘরে চা'য়ের মত নিজের আধিপত্য বিস্তার করিয়া দেশের মূল মর্ম্মে আঘাত করিতেছে। অথচ তাহার যথার্থ প্রতিবাদ বক্তৃতা দ্বারা হইবেনা, নীতি পুস্তকে হইবে না, উপদেশ দিলেও হইবে না,—হইবে একমাত্র এই শ্রেণীর সাহিত্যের প্রচারে,—ইব্‌সেনের পাশে যদি দেশের আদর্শ সুকুমার বেশভূষা পরিয়া গৃহস্থের দরজায় গিয়া দাঁড়ায়, বারবার তাহার কাতর কণ্ঠে দেশের বুকের আকুল প্রার্থনা বিনাইয়া বিনাইয়া গাহিতে থাকে—তবে দেশের আর কাহারও প্রাণে সাড়া না দিলেও জননী ভগিনীদের প্রাণে তাহা সাড়া দিবে নিশ্চিত। তাঁহারা যদি বর্ত্তমানে অন্য সাহিত্য পড়িতেন তবে ততটা ভাবিবার বিষয় ছিলনা, তাঁহারা যাহা পড়েন, বাংলার ভবিষ্যৎ বংশধরগণ যাহা পড়েন—বাধ্য হইয়া

বড় দুঃখে আজি তাহাই লিখিতে হইল—জীবনের সাহিত্য-সাধনা—গল্পের আকারে মূর্ত্তি ধরিয়া আজি যাঁহাদের দরজায় ঘা দিবার জন্য বাহির হইল, তাহা যে তাঁহাদের হৃদয়ের দরজাতেও একটিবার ঘা না দিয়া ফিরিয়া আসিবেনা,—অতি দুর্দ্দিনেও এ আশা আমরা করিতে পারি।

'অনূঢ়ার পত্রে'—যে সকল সমস্যা ও তাহার আংশিক সমাধানের ইঙ্গিত করা হইয়াছে, প্রত্যেক সমাজহিতৈষীর তাহা চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক, এবং আশা আছে যদি উহার দ্বিতীয় সংস্করণ হওয়া কখনও সম্ভবপর হয়, তবে "বৌদির উত্তরএ" কতকটা সমাধানের চেষ্টা আমরাও করিব। 'ইন্দু' শিক্ষাতা হইলেও অনূঢ়া, সুতরাং বালিকা; তাহাব চাপল্য ও বিদ্রোহ সুধী সমাজের মার্জ্জনীয়। আঘাতের পর আঘাতে মানুষের মন চটিয়া যায়, তাদৃশ অবস্থায় যথার্থ সত্য নিরূপণ দুর্ঘট হইয়া পড়ে, ইহারই ফলে অনূঢ়ার অনুযোগ ও বিদ্রোহের উৎপত্তি; ইহাসত্ত্বেও আমাদের পাঠক পাঠিকা 'ইন্দুকে' স্নেহের চক্ষে দেখিবেন আশা করিতে পারি।

পরিশেষে নিবেদন এই যে, যাঁহাদের যত্নে, আগ্রহে ও আনুকূল্যে পুস্তক দুইখানি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল, তাঁহাদের প্রতি চিরজীবন কৃতজ্ঞ রহিলাম। আমার অনভিজ্ঞতা বশতঃ প্রুফ্ দেখার কার্য্যটা সুসম্পন্ন হয় নাই, স্থানে স্থানে বর্ণাশুদ্ধি ইত্যাদি রহিয়াছে, পাঠক পাঠিকা তাহা মার্জ্জনা করিবেন।

সাধারণতঃ একশ্রেণীর গল্প ও উপন্যাসে উপকার অপেক্ষা অপকারই হইতেছে বেশি, ভগবানের কৃপায় যদি আমাদের এই পুস্তক প্রচারে কাহারও অন্ততঃ অপকারটা না হয়, তাহা হইলেই সকল পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

বিনীত গ্রন্থকার।

সূচীপত্র।

অনুরাগ পত্র ১

বৈরাগীর বন্ধন ২৭

গরীবের গর্ব্ব ৯৮

জুয়ারি ১৩০

অন্নদার পত্র।

তোমার পত্রখানা পাইয়াছি। যথাসাধ্য মনোযোগ সহকারে তাহা পাঠও করিয়াছি,—সত্য কথা বলিতে কি বৌদি,—পত্রের কতক অংশ বেশ বুঝিয়াছি, আবার কতক অংশ ভাল করিয়া ধরিতেই পারি নাই। যে অংশে সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের কথার মধ্য দিয়া তোমার বক্তব্যের শেষ হইয়াছে সেই অংশটাই ভাল বুঝিয়াছি বোধ হয়। আর যে অংশটাতে বিবাহিত নারীজীবনের অধিকার,সুখদুঃখ,এবং দাম্পত্যজীবনের চরম ও পরম লক্ষ্যের কথা লইয়া তোমার বক্তৃতার ফোয়ারা কেবলই উর্দ্ধমুখে ছুটিয়াছে মাপ করিয়ো বৌদি, আমি সেই অংশটা ঠিক প্রাণের মধ্য দিয়া ধরিতে পারি নাই, সুতরাং তাহা আমার পক্ষে নিতান্তই দুর্ব্বোধ হইয়াছে। হয়ত তুমি বলিবে—"এযে তীর্থের কাহিনী, ভাগ্য ও পুণ্যবলে সেইতীর্থে না গেলে ইহা কেহ তেমন ভাবে বুঝিতে পারে না। উহা নিরালম্ব ভাব বা ভাষার সাহায্যে কেহ ধরিতে পারে না. উহার অবলম্বন সংসারের, শুধু সংসারের নহে ইহকাল পরকালের সারসর্ব্বস্বদেবতা স্বামী, আর সেই তীর্থ স্বামিগৃহ" !—

মানিলাম বৌদি,—কিন্তু দাদার মত বরটী আর মা'র মত শাশুড়ীটী বাংলার সকল মেয়ের ভাগ্যেই জুটে না! সংসারের আনন্দ ও শান্তি যাহার ভাগ্যে হাত ধরাধরি করিয়া উপযাচক হইয়া দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার মুখে শুধু আনন্দ ও শান্তির সংবাদ ছাড়া আর কিছু শুনা যাইবে না।

জানি ; সে শুধু সংসার স্বর্গের নন্দন কাননে পারিজাতের মালা গাঁথিয়া গাঁথিয়া 'বঁধুয়ার' গলেই পরাইবে ;—সে জানে না স্বর্গের পাশাপাশি নরক বলিয়াও একটা জায়গা আছে। আনন্দের পাশে বিষাদ, আলোর পাশে অন্ধকার, জীবনের পাশে মরণ, আর আদর্শ দাম্পত্যজীবনের পাশেও ভঙ্গপ্রবণ কর্কশকঠোর দাম্পত্যমৃত্যু ইহ সংসারেই বর্ত্তমান রহিয়াছে !

বৌদি, ভাগ্যদোষেই হৌক্ বা ভাগ্যগুণেই হৌক্—আমি অনূঢ়া, বয়স আমার আঠার। নিজে স্ত্রীজাতি বলিয়া বাংলার স্ত্রীজাতির সুখ দুঃখের সংবাদ এই বয়সেই অনেকটা রাখি। সুতরাং তোমার কল্পিত আদর্শের লোভনীয় ব্যাখ্যা আমি বেশ করিয়া বুঝিতে পারি নাই !

বৌদি,—মাটীর দেবতা লইয়া সেবা পূজা করা সহজ,—চলে ; কিন্তু রক্তমাংসের জীবন্ত দেবতা লইয়া চব্বিশ ঘণ্টার জীবন যাত্রা খুব আদর্শ রক্ষা করিয়া চলিতে পারে কিনা সন্দেহ ! বিশেষতঃ দেবতার আগে কতকগুলি উপসর্গ যোগ করা যেখানে একান্তই বাধ্যকর হইয়া উঠে ! তবে চলিতে পারিত বৌদি, যদি সাবেক আদর্শ স্ত্রীপুরুষ উভয় জাতির মধ্যেই আবার অনুসৃত হইত ! যদি আমরা যথার্থই—

"গৃহিনী সচিবঃ সখী মিথঃ—
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ !"—হইতে পারিতাম !

আর তাঁহারাও "শরীরার্দ্ধং স্মৃতা জায়া" মনে করিয়া আমাদিগকে যথার্থ অর্দ্ধাঙ্গিনী করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেন, এবং "যত্র নার্য্যস্ত-পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ" মনে করিয়া গৃহ পালিত পশুর মত

কেবল খোরপোষের ব্যবস্থা করিয়াই নিশ্চিন্ত না থাকিতেন! হায় বৌদি!—

* * * * *

বৌদি, তোমার একটা কথা পড়িয়া আমি হাসিয়া একা একাই দম ফাটিয়া মরিতেছি। "বাংলার গৃহিণী বাংলার রাণী"!—হবে! তুমি যখন 'গৃহিণী' আর আমার দাদার মত বর! হাল বসতি সিমলা পাহাড়ে, লাট সাহেবের প্রাসাদ আর সাহেব বিবির গাদার মধ্যে নিজের বাংলার ধ্যান ধারণাটুকু পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলিয়া তুমি এখন কল্পনার আকাশে সুখের পাপিয়া সাধা গলায় দিগন্ত ভরিয়া দিয়া আপনার ভাবে আপনি বিভোর! গাও বৌদি, আকাশের অন্তস্তল সুধা সঙ্গীতে ভরিয়া দিয়া তুমি আনন্দের গান গাইয়া যাও, বাধা দিব না, কিন্তু বৌদি, আজ শুধু একটা কথা তোমায় বলিয়া রাখিতেছি—বাংলার সকল গৃহিণীই 'বাংলার রাণী' নহেন,—আর এই রাজাগিরি বা রাণীগিরি এক কথায় বলিতে গেলে উহা সাফ—যাত্রাগানের—পোষাক পরা রাজা-রাণীর অভিনয় মাত্র!

বৌদি, বাংলার—ভাব রাজ্যে আস্তে আস্তে যে বিপ্লব প্রবেশ করিতেছে, তাহাতে এ রাজত্বের অভিনয় টুকুও বেশী দিন টিকিয়া থাকিবে কিনা ভগবান জানেন। আমাদের গৃহ, গৃহকর্ত্তা, গৃহিণী এক কথায় যার নাম সংসার, বাংলার এই সংসারটার মধ্যেই বিষম গোল বাঁধিয়াছে। বাংলার মূল আদর্শের শোচনীয় পরিবর্ত্তনের ফলে ভোগের নাম হইয়াছে সুখ, নেশার নাম হইয়াছে ভালবাসা বা প্রেম, পাওনাদারের যথার্থ

পাওনা দেওয়ার নাম হইয়াছে ত্যাগ স্বীকার! বামুন চাকরকে মাইনে দেওয়ার নাম দান দক্ষিণা, কদাচিৎ ভাই ভগিনীর গ্রাসাচ্ছাদন বহনের নাম হইয়াছে বদান্যতা, মৌখিক ভদ্রতার নাম শিষ্টাচার, মা বাপ্‌কে ফাঁকি দিয়া স্ত্রীর গায়ের 'সোনাদানার" নাম হইয়াছে স্ত্রীধন; আর দু'দশটা ঝি চাকরের উপর কর্ত্তৃত্ব করার নাম হইয়াছে গৃহিণীর রাণীগিরি! বৌদি, যথার্থ সুখের আদর্শ অনেক দিন হইতেই আস্তে আস্তে লোপ পাইতে বসিয়াছে, তোমাদের এই 'বাংলার গৃহিণী বাংলার রাণীর" দলকে ভবভূতির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয় "বৎসে! এবমাত্মা স্তূয়তে" !

* * * * *

বাংলার গৃহিণী, বাংলার রাণীই থাকুন আর যাহাই থাকুন, তাঁহারা খুসী থাকিলে আমরাও খুসী আছি! কিন্তু বাংলার এই অনূঢ়া কন্যার-দলকে তোমাদের 'রাণীরা' কি বলিয়া ইতঃপর নির্দ্দেশ করিবেন, তাহা যদি ভাবিয়া থাক, তবে এই অনূঢ়া অষ্টাদশীকে জানাইয়া বাধিত করিও! আমার মনে হয় বৌদি, এই অনূঢ়ার দল, বাংলার এই অবজ্ঞাত পরাধীন জাতি আজ বাংলারই বুকের উপরে নৈরাশ্যের চিতা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ব্যক্তিগত অধিকার সুখদুঃখের স্বাধীন ধারণা আর আনন্দময় জীবনের স্ফূর্ত্তি—এই সকলের একত্রে আহুতি দিবার জন্য বধূবেশে যূপকাষ্ঠের পাশে উৎসৃষ্ট পশুর মত মালাসিন্দুর পরিয়া অপেক্ষা করিতেছে! তোমরা 'বাংলার রাণীর' দল ঘাতকের খড়্গের তাড়নাতেই হউক বা মন্ত্রের মহিমায়ই হোক্ এইমাত্র অতীত অবস্থা ভুলিয়া গিয়াছ। যদিও

তাহা বিবাহিত জীবনে প্রায় সকলেই ভুলিয়া যায়। 'বাংলার রাণীর' দলের এই বিস্মৃতি শুধু আত্মবিস্মৃতি নহে, ইহা নারীজাতির মর্য্যাদা বিস্মৃতি, নারীর প্রতি বর্ত্তমান বাংলার এই অবজ্ঞা, এই নীচতা তোমরা 'রাণী'র দল কেবল যে চোথ বুজিয়া সহিয়া যাইতেছ তাহা নহে, তোমরাই আবার পুত্রের জননী হইয়া অনূঢ়াজাতির সর্ব্বপ্রকার মর্য্যাদা হানি করিবার বন্দোবস্ত নিজেদের হাতে করিয়া যাইতেছ। হায় বাংলার রাণীরদল, তোমরা জান না, এই অসহায় নারীজাতির কুমারী জীবনের মধুর স্বপ্নকানন, তোমরা কেমন নির্দ্দয় কুঠারে নিজের হাতে ছিন্ন করিয়া দিতেছ, আবার ছিন্ন বিধ্বস্ত লতাগুলি অবজ্ঞা ও অনাদরে ঝেঁটাইয়া আনিয়া নিজেদের প্রাণাধিক পুত্রগণের গলায় জড়াইয়া দিয়া একটা পৈশাচিক হাস্যে সদ্যোবিবাহিত নারীকুলের বুকের রক্ত শুষিয়া লইতেছ। বৌদি, বাংলার পুরুষের অত্যাচার যদি বা সহ্য করিতে পারিতাম, কিন্তু এই মাতৃজাতি, 'বাংলার রাণীর' দলের অমানুষিক অস্বাভাবিক অত্যাচার আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেছি না। যত দিন যাইতেছে (হাসিও না, বিবাহের জন্য নহে) আমি এ সকল চিন্তায় একেবারে বিব্রত হইয়া পড়িতেছি। এ সকল পক্ষপাত, অবিচার এবং অত্যাচারে আমার মন একান্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে, বৌদি দাদাকে বলিও আমি "বিবাহ" করিব না অর্থাৎ অবজ্ঞার বিনিময়ে আত্ম বিক্রয় করিব না। আমি হয়ত অনূঢ়াই থাকিয়া যাইব। তবে একটা কথা এই যে বর্ত্তমান বাংলায় অনূঢ়ার কোন একটা উজ্জ্বল আদর্শ নাই, বরং অশীতিবর্ষ বৃদ্ধের সহধর্ম্মিণী হইয়া ফুলশয্যার রাত্রেই হাতের শাঁখা আর কপালের

সিন্দুর খোয়াইয়া বসিতে পারিলে হিন্দু বিধবার একটা উজ্জ্বল আদর্শ পাওয়া যায়, তাহা লক্ষ্য করিয়াও চিরজীবন একমত কাটাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, তাহাতে যথার্থ শান্তি ও সান্ত্বনার বেশ সম্ভাবনাও আছে, কিন্তু এই অনূঢ়ার জীবন? এক সময় কুললক্ষ্মীরও একটা গৌরব ছিল, পোড়া বাংলা এখন সব খোয়াইয়া 'নিধিরাম সর্দ্দার' হইয়া বসিয়া আছেন! যাঃ!—

* * * * *

প্রাচীন ভারতে 'স্বয়ম্বর' প্রথা ছিল, কন্যাগণ নিজের স্বাধীন বুদ্ধিতে বর নির্ব্বাচন করিতেন, প্রথা ভাল ছিল কি মন্দ ছিল বলিতে চাই না, অথবা ততটা বুঝিতে পারি না, কিন্তু এমন শুনা যায় না যে অমুকস্থানে স্বয়ম্বর প্রথার ফলে কন্যা রূপজ মোহে অপাত্রে মালাদান করিয়াছেন। কেন এমন হয় নাই? আমার মনে হয় তখনকার দিনে কন্যাগণ রীতিমত শিক্ষালাভ করিয়া শিক্ষার অমূল্য সম্পদ্ সংযম লাভে যথার্থ চরিত্রবতী হইতেন, এবং তাঁহারা চার ও ভাটগণের মুখে যোগ্য রাজকুমারগণের দোষগুণের বিশেষ আলোচনা শুনিয়া পুরুষোচিত শৌর্য্যবীর্য্যাদিগুণের পক্ষপাতিনী হইতেন, মানব চরিত্রের দৈহিক প্রভাব অবগত থাকা হেতু সভাস্থলে সহস্র যুবার আশা প্রদীপ্ত মুখের দিকে এক সঙ্গে তাকাইয়াও মনোমত বরটীকে দেখিবামাত্রই চিনিয়া লইতে বিলম্ব ঘটিত না। সেইজন্য প্রাচীন কালের 'স্বয়ম্বর' প্রথায় কন্যাগণ পথভ্রান্ত হন নাই। যথার্থ শিক্ষা ও সংযম আয়ত্ত হইলে তাহা দ্বারা কি পুরুষ কি নারী সকলেই একই প্রকার ফল লাভের অধিকারী হইয়া থাকে।

প্রাচীন ভারতের নারীগণের চরিত্রমহিমা শিক্ষা ও সংসর্গেরই ফল বলিতে হইবে,যাহা হোক তবু এই 'স্বয়ম্বর প্রথার মূলে একটা খুঁত না থাকিত এমন নহে। আমি সমাগত বিবাহ প্রার্থীগণের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহের কথার ইঙ্গিত করিতেছি না বৌদি, সেটা নিতান্ত বাইরের কথা। আমার মনে হয় সেখানেও সমাগত অকৃতার্থ বরের দল, কন্যার ব্যবহারে বিরক্ত না হইয়া যাইতেন না। নারীজাতির এই ব্যবহারের মূলে তাঁহারা ঘৃণা অবজ্ঞা বা অহঙ্কার ইত্যাদি ভাবের আরোপ করিতে ছাড়িতেন না। তাঁহারা হয়ত ভাবিতেন, "আমরা কি নচ্ছার, একটা স্বয়ম্বর সভায় এত-গুলি গুণী, জ্ঞানী যুবার দলকে একত্র করিয়া বসাইয়া মেয়েটা কিনা বাজারের সওদা করার মত একজনকে কিনিয়া লইয়া গেল, আমরা হয়ত আর এক অহঙ্কারী কন্যার অন্য এক সখের বাজারে আবার আত্ম বিক্রয়ের জন্য এমনি করিয়া একদিন জড় হইব ধিক্!—ইত্যাদি"—বৌদি, ভাবিয়া দেখ সেই একদিন আর এই এক দিন। তবে পুরুষ জাতি, আমাদের 'মুনিবের জাতি' কিনা, তাঁহাদের এতদিনের অভিশাপ জমিয়া জমিয়া কাল বৈশাখীর পুঞ্জীভূত মেঘস্তরের মত আজ বাংলার এই অনূঢ়া কন্যা-জাতির মাথায় প্রলয়ের হুঙ্কারে নামিয়া আসিয়াছে। ইহাকে ঠেকাইয়া রাখিবে কে? এখন কন্যার কেন তাহার বাবারও কোন কথা বলিবার অধিকার নাই।

তুমি লিখিয়াছ "বাবুর দল' বিলাতী ধরণের বিবাহে কিছু আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিতেছেন, তাঁহারা উভয়তঃ স্বয়ং নির্ব্বাচন প্রথা চালাইতে অভি-লাষী" কি সর্ব্বনাশ! বৌদি, তোমার পায়ে পড়ি এসকল চিন্তার সাহায্য

করিয়া দাদার মাথাটা বিগড়াইয়া দিও না। বাংলার বাবার দলের নির্ব্বাচন এখন নাই বলিলেই হয়, এখন যাহা আছে তাহা মিশ্রিত দলের নির্ব্বাচন, সেই কথা পরে বলিতেছি,---সেই মিশ্রিত দলের নির্ব্বাচন দেখিয়া হতাশ হইয়াছি, কেবল বরের নির্ব্বাচনও দেখিয়াছি, তাহাতে হাসিব কি কাঁদিব কিছুই বুঝিতে না পারিয়া নাক ডাকিয়া ঘুমাইয়াছি, এইবার যদি বাংলার এই শিক্ষাদীক্ষাশূন্য সুতবাং মোমের পুতুলী অনূঢ়াগণের উপর এই দারুণভার অর্পিত হয়, তবে বৌদি, আর রক্ষা থাকিবে না। বর কন্যার মিলিত নির্ব্বাচনে কুলের দেবতা অন্তর্হিত হইবেন, কিন্তু উল্লাসে নৃত্য করিবেন ফুলের দেবতা! বৌদি, দোশাই তোমার! এমন অপরিণতচিত্তা কিশোরীর হাতে এই কঠিনকার্য্যভার অর্পণ করিও না, তাহাবা ভাল করিতে যাইয়া মন্দ করিয়া বসিবে, চন্দন-ভ্রমে বিষ গ্রহণ করিবে, রূপ ও মোহ তাহাদের হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করিয়া তুলিবে, পরিণামে হাহাকার বৌদি, হাহাকার, শুধু হাহাকার!—

* * * * *

বৌদি, মাঝখানে আরও একটা কথা বলিয়া রাখিতেছি। আমাদের শিক্ষা দীক্ষার অভাব মোচন ও সুখ স্বাধীনতার বৃদ্ধিকল্পে একদল নব্য বঙ্গ, একবারে 'কাঠেকুড়ুলে' লাগিয়াছেন, আমার দাদাটীকেও তুমি এই দলের মধ্যেই ধরিয়া লইতে পার। তাঁহাদের মধ্যেও আবার নানা দলাদলি আছে, কেহ চান, আমরা মেমেদের মত ঘোড়ায় চড়িয়া হাওয়া খাইয়া বেড়াই। কেহ চান, আমরা ঘরের লক্ষ্মী 'ঘরে ও বাইরে' পেখম ধরিয়া নাচি। আবার কেহ চান, আমরা স্বাধীনভাবে পুরুষজাতির সহিত

প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া সংসারে নিজেদের পথ বড় করিয়া লই, কেহ চান্, আমরা বল্ নাচি, ' বাগান পার্টি'' করি,—'টেব্লো' অভিনয় করিয়া স্বামীর মুখ উজ্জ্বল করি, আর কেহবা চান্, আমরা কেবলই গাহিব, নাচিতে পারিব না, মাথার কাপড় খানিকটা স্থানচ্যুত করিয়া বেড়াইতে পাইব বটে, কিন্তু নাথের সঙ্গে এক গাড়ীতে! ডাক্তারি শিখিব, ভিজিট লইতে পাইব না, সকলেরই সঙ্গে মিশিতে পারিব, কিন্তু একাকী নহে, মাথামুণ্ডু কত লিখিব? এসকল দেখিয়া শুনিয়া আমাব হাড় জ্বলিয়া যায়। হায় গুণপুরুষ এসকল বিলেতের বকেয়া চাল চালিয়া বাংলার এই অবোধ জাতিটাকে ছলনা করিতে চাও? লজ্জা করে না? তোমার নিজের সুখ সুবিধা ও ভোগের খাতে নারীজীবনকে বহাইবার চেষ্টা তুমি যতই কর না কেন, 'দাসী' নাম ঘুচাইয়া বাহিরের ব্যাপারে ভোগানুবন্ধী স্বাধীনতা প্রদানের চেষ্টা যতই করনা কেন, বাংলার নারী অবুঝ হইলেও তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবে। আসলে আর নকলে যে পার্থক্য তাহা ধরিয়া লইতে বাহিরের জিনিষের বেলা কখনও কতকটা দেরি হইতে পারে বটে, কিন্তু হৃদয়ের জিনিষ লইয়া যথার্থ প্রাণের কারবার লইয়া আসল নকলের পার্থক্য ধরিয়া লইতে এক মুহূর্ত্তও দেরি হয় না, এই সত্যটা যদিও আজ দীর্ঘকাল পরে ইউরোপের নারীজাতি হাড়ে হাড়ে বুঝিয়া লইয়াছে, কিন্তু বাংলার এই আধ্যাত্মিক জাতির পক্ষে তাহা বুঝিয়া লইতে বেশি বিলম্ব হইবে না,—হইতে পারে না। হায় পুরুষ তুমি জান না, নারীর হৃদয় লইয়া স্বর্গে যাওয়া চলে, খেলা করা চলে না।

বাংলার নারীর মূলধাত ঠিক্ করিবার আগে তার সংস্কার করিতে

প্রয়াস পাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। বৌদি. তোমার পায়ে পড়ি, দাদাকে পথ দেখাইও। নব্য বঙ্গকে জানিতে দাও—নারী খেলা করিবার জিনিষ নহে, তোমার ঘরের মূল্যবান্ আস্‌বাব পত্রের সামিলে নয়নমনোমুগ্ধকর অবস্থায় সাজাইয়া রাখিবার জন্যও নহে, নারী তোমার শুধু "শরীরার্দ্ধং" নহে— নারী সম্বন্ধে একখানি বইয়ে পড়িয়াছি—

"অর্দ্ধোবা এষ পুরুষঃ যাবৎ জায়াং ন বিন্দতি,
অথ জায়াং বিন্দতি পূর্ণো ভবতি"—(ঐতারয় ব্রাহ্মণ)

একজন বড় পণ্ডিত ইহার মানে বলেন পুরুষ ততদিন অর্দ্ধেক বা আধখানা থাকেন যতদিন জায়া লাভ না হয়, জায়া লাভ হইলেই তিনি পূর্ণ হন। এই আদর্শ লক্ষ্য করিয়া নারী জাতির মূলধাত ধরিতে হইবে, তাহা যদিও অনেক খানি আবরণের নীচে লুপ্তপ্রায় হইয়া রহিয়াছে, তবু তাহাকে খুঁজিয়া চেষ্টা করিয়া বাহির করিতে হইবে। নারীর স্বাভাবিক স্নেহ মমতা. সেবা যত্ন, ধর্ম্মপ্রবণতা দানধ্যান, অতিথিতৎপরতা, তীর্থসেবা, সন্তান বাৎসল্য এবং গৃহকর্ত্রীতার নাম দাসীগিরি নহে, মূলসূত্রে যাহা বলিয়া আসিয়াছি সেই "শরীরার্দ্ধং স্মৃতা জায়া" সেই যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা" সেই "অর্দ্ধো বা এষ পুরুষঃ ইত্যাদির সহিত সমস্ত কোমল নারীপ্রকৃতির সামঞ্জস্য সাধিত হইলে ইহারই নাম 'বাংলার রাণী-গিন্নি! বৌদি, ঠাকুর মা বলিয়াছিলেন আগেকার দিনে বাড়ীর দাসীটীর যে সম্মান ছিল, বর্ত্তমান গিন্নিরা নাকি তাহার আধ খানা সম্মানও পান না, অথচ তাঁহারা গতরের 'সোনাদানার' ভারে নিজেদের ওজন ঠাহর করিয়া উঠিতে পারেন না। নারীজাতির প্রতি 'তথা কথিত'

উদারতা প্রদর্শনেব গর্ব্বে তোমাদের নব্য বঙ্গ একেবারে আত্ম প্রসাদে কৃতকৃতার্থ! বৌদি, ইহাদের বিশ্বাস করিও না, ইহাদের এই নারীদুঃখমোচনপ্রবৃত্তি স্বাভাবিক কারণে উদ্ভূত নহে, উহা আগন্তুক, বিলাতের সমাজের সঙ্গে টক্কর দিবার জন্য একটা সাময়িক উত্তেজনায় এই প্রবৃত্তির উৎপত্তি,—ভোগানুসন্ধানমূলক সংস্কারপ্রয়াসে উহার বিকাশ, এই আন্দোলন দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে, কিন্তু নারীজাতির বিশেষতঃ বাংলার নারীর, অন্তরের যথার্থ অভাব এই সংস্কারে দূর হইবে না, হইবে না, হইবে না! নব্য বঙ্গের মূল চরিত্রের গতি কোন্ দিকে যদি আমি এই পাঁচ বৎসব ধরিয়া নিজের হতভাগ্য গৃহিণী পদের উমেদারী জীবনের প্রত্যক্ষমূলক অভিজ্ঞতার ফলে ঠিক্ ঠিক্ বুঝিয়া থাকি তবে তোমায় আবারও বলিতেছি, নব্য বঙ্গের উদ্দেশ্য সাধু হইলেও তাঁহারা পথ হারা, তাঁহাদের কৃত্রিম চেষ্টা আমাদের দুঃখ দূর করিতে পারিবে না। বৌদি শুনিয়া যাইও, আমার অভিজ্ঞতার এক একটী উদাহরণ, আর বিচার করিয়া দেখিও আমরা এহেন জাতির জননী, যদি লজ্জা থাকে, তবে বসুন্ধরার নিকট হইতে মুখ গুঁজিবার গর্ত্ত মাগিয়া লইও!

*   *   *   *   *

মাসীমার গঙ্গা লাভের পর আমার মাসতুত বোন্ শুভা সেই যে আমাদের বাড়ী আসিয়াছিল, আজও সে আমাদের এখানেই আছে, এবং যে পর্য্যন্ত তাহার কুমারী জীবন না ঘুচে সেই পর্য্যন্ত আমাদের এখানেই থাকিবে—তাহা তুমি এবং দাদা সকলেই জান। শুভার মত মেয়ে

এতল্লাটে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রূপেগুণে বিদ্যা বুদ্ধিতে তাহার জুড়ি মেলা ভার! আমি অষ্টাদশী, সে বোধ হয় সপ্তদশী। শুভাকে পার করিবার ভার বাবার উপরই পড়িয়াছে, বাবা চেষ্টারও ত্রুটী করিতেছেন না, তবু শুভার 'বর' মিলিতেছে না। শুভাকে যাঁহারা দেখিতে আসেন তাঁহারা একবার আমাকে না দেখিয়া যাইতে চান না। আগেকার ঘটনা সবই তোমায় লিখিয়াছি, এই মাস দুই তিনের ঘটনা তোমায় সংক্ষেপে লিখিতেছি।

* * * * *

আষাঢ় মাস, একটু একটু বৃষ্টি পড়িতেছে, আকাশ নিবিড় মেঘে আচ্ছন্ন, কলিকাতার রাস্তায় গাড়ী, ট্রাম, মোটর প্রভৃতির অভাব নাই, গাড়াবারাণ্ডায় একখানা মোটর থামিয়াছে দেখিয়া মেজদা, ভূপেন ও ছোট কাকা তাড়াতাড়ি নীচে গেলেন, জুতার 'মস্‌মস্‌' শব্দের সহিত ছোট বড় ও মাঝারি রকমের কথাবার্ত্তা ও হাসির রোল উপরে আসিতে লাগিল, শুনিলাম "'শুভা'কে দেখিতে 'বর' ও বরপক্ষ আসিয়াছে"। কতকটা সংবাদ আগেই জানা ছিল, কিন্তু বৃষ্টির জন্য সকলেই ভাবিয়াছিলাম আজ বাঁচা গেল। তা হইল না, পাত্র স্বয়ং আসিয়া পালের আগে একখানা কেদারা দখল করিয়া বসিলেন। শুভাকে সাজাইলাম, মা শুভার জন্য আমার মত একস্যুট্ গহনা ও আবশ্যক জামাকাপড় তৈরি করিয়াছেন, আজ শুভাকে তাহাই পরাইলাম, আহা কি চমৎকার মেয়ে বৌদি; বর ও বরপক্ষ আসিলেন, শুভা একটী ছোট রকমের নমস্কার করিল। নিষেধ সত্ত্বেও শুভার পাশে আমিই দাঁড়াইয়া তাহাকে

আবশ্যক মত অভিনয় ও উত্তর প্রত্যুত্তরাদি করাইতেছিলাম, বর জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তোমার নাম" ?—

"শুভা"—

"শুভা" ?—

"আজ্ঞে হ্যাঁ"—

"চমৎকার নাম"—

শুভা নীরব, বর বলিলেন—"তুমি কি রং মেখেছ ?"—শুনিয়া শুভার মুখ লাল হইয়া গেল, আমি বুঝিলাম অনুরাগে নহে রাগে !

বর শুভার হাতখানি ধরিয়া বলিলেন—

"এগহনাগুলা কার ? তোমার মা বাপতো ছিলেন নাকি খুব গরীব ; এগুলা খাঁটি তো ?" বর বিজয়ীর গর্ব্বে একটু একটু হাসিতেছিলেন শুভা রাগে ও লজ্জায় কাঁপিতেছিল, আমি একটা উত্তর দিতে চাহিয়াও মেজদার ইঙ্গিতে নীরব হইয়া গেলাম।

পাত্রপক্ষের মধ্যে একজন একটু বয়স্ক ছিলেন তিনি কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ ভাবে বলিলেন, "না সুরেন্, দেখ্‌তে পাচ্ছনা ওর কি চমৎকার রং ওতে কি আর রং মাখাতে হয় ? এই যে গহনা দেখছ ও সোনার উপর মীনার কাজ করা হেমিলটনের বাড়ীর স্যুট্, বাজে কথা রাথ কাজের কথা কও।"

পাত্রটী নীরেট মূর্খ হইলেও নাট্যরোগগ্রস্ত ধনবানের সন্তান, সুতরাং উপস্থিত ক্ষেত্রে লজ্জা নিবারণের জন্য ঝট্ পট্ বলিয়া উঠিলেন,—"নাঃ

সে কথা হচ্ছেনা, গহনা আসল হোক্ আর নকল হোক্, তাতে আমার আস্‌বে যাবেনা, ওরকম গহনা আমি যেখানে সেখানে উপহার দিই। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ থাক্‌লে এগহনা বোধ হয় পর্‌বেও না,—তবে কিনা একটা কথা এই যা, গরীবের মেয়ে রীতিমত শিক্ষিতা না হলে বনিয়াদী ঘরের কায়দা কানুন বজায় রেখে চল্‌তে পারে না, হীন আবহাওয়ার মধ্যে থেকে ওদের হৃদয়ও হীন হয়ে যায়! তাই পরখ করে নিচ্ছিলাম!"

সহসা আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"ইনি কি রমণীবাবুর মেয়ে? তোমার নাম?—"

আমি বলিলাম "ইন্দু"—

বর—"বাঃ অতি চমৎকার নাম।"—"আমি ভাবিতেছিলাম "শুভা চমৎকার নাম, ইন্দু অতি চমৎকার নাম!"

বর বলিলেন,—যতীন্ বাবু ওর সম্বন্ধ হয় নি?—

মেজদা বলিলেন,—এখনও হয়নি, চেষ্টা চল্‌ছে!—

বর—"চেষ্টা"?—অমন মেয়ে লুফে নেবে," বলিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

মেজদা আমাদের ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন,—"তোমরা যাও"।

বর—থতমত খাইয়া বলিলেন,—"আমার পরীক্ষা এখনো শেষ হয় নি!"

মেজদা বলিলেন শুনিলাম,—"আজ্ঞে আমাদের পরীক্ষা হয়ে গেছে, এখন আস্‌তে আজ্ঞা হয়!"

সেই বয়স্ক লোকটী একটু বিমর্ষ হইয়া বলিলেন,—

রাগ্ কর্বেন না যতীন্ বাবু,—'ইনি, ইনি'—মেজদা বাধা দিয়া বলিলেন শুনিলাম,—রাগ কিসের নন্দবাবু, বাংলায় ওরা মেয়ে হয়ে জন্মেছে রাতদিন অপমান সইবার জন্য আর আমরা বাপ্ ভাই হয়ে জন্মেছি ওদেরই অপমান নিশ্চেষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে শুন্বার জন্য!—আচ্ছা নমস্কার!" বরপক্ষ বাধ্য হইয়া নামিয়া গেলেন, ক্রুদ্ধ বরের টানাহাসিমিশ্রিত আওয়াজ আমার কানে আসিল, তিনি বলিতেছিলেন,—

"নন্দবাবু, এইজন্যইত এদের আজও বর মেলেনা'!—

নন্দবাবুর ব্যঙ্গস্বর একটু শুনাগেল,—"তা বৈকি?"—

*　　*　　*　　*　　*

সেই আষাঢ় মাস। আজও একটু একটু বৃষ্টি পরিতেছে, তবে আজ শুভার নহে, আজ আমার পালা! এক পাল মর্দ্দ, অধিকাংশ "হেট্ কোট্" ধারী বাড়ী কাঁপাইয়া দোতালায় আসিয়া বসিল, বরের বেশে অদ্ভুত রকমের সমাবেশ! তা তুমি সিমলায় বসিয়া অনেক দেখিয়া থাক, লিখিয়া পুঁথি বাড়াইতে চাইনা,—বরপক্ষ বসিলেন, মেজদা বলিলেন; 'অনুমতি কর্লে আমার বোনকে আন্তে পারি'! আমাকে সাজাইয়া গুছাইয়া আগে হইতেই প্যাক করিয়া রাখিয়াছিল, সুতরাং পৌঁছিতে দেরী হইল না!

বর বলিলেন শুনিলাম "আস্তে পারেন,—প্রথামাত্র," আসিয়া একটী ছোট নমস্কার করিলাম। প্রশ্ন হইল, "তোমার নাম?"—আমি বলিলাম "ইন্দু"

প্রশ্ন।—"তুমি ইংরাজী জান?"

উঃ।—"অতি সামান্য"

প্রঃ।—"তুমি গাইতে বাজাতে জান?"

উঃ।—"সামান্য"।

প্রঃ।—এখন তাতেই চল্‌বে, আমি বিলেত থেকে এলে যেন তোমায় আমার উপযুক্ত মেম সাহেবরূপে দেখ্‌তে পাই। এরি মধ্যে তৈরি হয়ে থাকবে! পারবে ত?

আমি নিরুত্তর রহিলাম!

বর একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—

"দেখুন যতীন বাবু, আমার এসকল দেখ্‌বার শুন্‌বার কিছুই দরকার নেই, এখন যেমন তেমন হলেই চল্‌বে। শেষটা নিজেই তৈরি করে নিতে পার্‌ব! টাকাও সেখানকার খরচটা কিন্তু আমাকে আগাম দিতে হবে। মাস মাস তাগিদ দেওয়া কিন্তু আমার পোষাবে না। ভাল তুমি নাচ্‌তে জান?—"

আমি রাগে গস্‌ গস্‌ করিতেছিলাম, সাহেব বল্‌নাচের মতলবে যে প্রশ্নটা করিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিলাম, সাহেব যে তখন বিলাতের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। হঠাৎ বলিয়া উঠিলাম—"আজ্ঞে না, তবে নাচাতে বোধ হয় পার্‌বো।" মেজদা মুখ টিপিয়া হাসিতেছিলেন।

প্রশ্ন হইল, "কি রকম?"

আমি মুখ নীচু করিয়া একশ্বাসে বলিয়া ফেলিলাম,—"আজ্ঞে এই রাস্তায় হামেসা যা দেখ্‌তে পাওয়া যায়।"

"নাকে দড়ি বেঁধে"—সাহেবের পাদপূরণ শুনিয়া ঘরে একটা হাসির রোল পড়িয়া গেল। কোন মতে একটী নমস্কার আদায় করিয়া আমি সেখান হইতে ছুটিয়া চলিয়া গেলাম।

পরে জানিলাম সে নাকি মহাখুসী, 'মেমসাহেব' লজ্জাহীনা বা চতুরা হইলে নাকি সাহেবের খুব সম্মান বাড়ে, এমন সাহেবের মুখে আগুন!

মেজদা এমন ফক্করের হাতে আগাম সকল টাকা তুলিয়া দিতে সাহস করিলেন না, কাজেই বিবাহ হইল না। বিবাহ ত আমার সঙ্গে নয়, বিবাহ টাকার সঙ্গে! বর যে বিলাত যাত্রী!—

*　*　*　*　*

শ্রাবণ মাস। অনেক চেষ্টা চরিত্রের পর মামা বাবু শুভার জন্য একটী বর আনিয়াছেন। বরটী ডবল ছাড়াইয়া তেডবল বর। তিনটী পরিবারই বর্ত্তমান, বরের বয়স ত্রিশের বেশী হইবে না, দেখিতে কাল, চোখ কটা, নাক বসা, গোফ জোড়াটী সুপুষ্ট ও সুদীর্ঘ! শিরে টেরির ঢেউ নাচিয়া চলিয়াছে। বরের জমিদারী আছে, বিদ্যাও আই, এ, ক্লাস পর্য্যন্ত ইতি, বাস্ আর চাই কি? শুভাকে দেখিয়া বরের আর আনন্দের সীমা নাই, নাম জিজ্ঞাসা করিবার আগেই শুভার রূপের বর্ণনা কপচাইতে লাগিলেন, জমিদার বর—হয়ত নিশ্চয় ভাবিয়াছিলেন 'বিধির বিধান' বোধ হয় ফলিয়া গিয়াছে, সঙ্গীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'আহা কি দিব্য গড়ন! বড়রাণীর নাকের সঙ্গে অনেকটা মেলে, বড় রাণীর বাহুযুগলের খানিকটা যেন কেটে এনে কেউ জুড়ে দিয়েছে! ভ্রূজোড়াটী চমৎকার, রংটাও বড় রাণীর চেয়ে উজ্জ্বল, চুলটা মেজরাণীর মতই চিক্কণ

এবং কাল, মেজরাণীর রংটা যদি এর মত হতো, আর দেখ ছোটরাণীর সব্বই ভাল ছিল নামটা কেমন বিশ্রী—'কালিন্দীসুন্দরী' ছিঃ, ছিঃ, এই বিংশ শতাব্দীতে কিনা মেয়ের নাম রাখে কালিন্দী সুন্দরী। হ্যাঁগা তোমার নাম?—

শুভা।—'শুভা'—

বর।—'শুভা? আহা কি চমৎকাব নাম! লেখা পড়া জান?'

শুভা।—'সামান্য'।

বর।—'বলত শ্বশুবকে সাধু ভাষায় কি বলে?'

শুভা।—'শ্বশুর'।

বর হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন তিনি গর্ব্বের সহিত কহিলেন "আজ কাল কি আর মৌলিক চর্চ্চা কিছু আছে? এতমেয়ে মানুষ এখনকার অনেক বি, এ, এম্ এ, পুরুষেও এসকল সাধু ভাষার খোঁজ রাখেন না। আমরা এফ, এতে যা পড়েছি, এখন এম, এ তেও তা পড়ায় না। এখনকার বিদ্যে কি আর পাকে মামাবাবু?" শোন আমি বলে দিচ্ছি, শ্বশুরত সবাই বলে, একি আর সাধুভাষা? সাধু ভাষায় শ্বশুরকে বলে শ্বশ্রূ বুঝলে? আচ্ছা বল দেখি সতীন্‌কে সাধু ভাষায় কি বলে?—

শুভা। "সপত্নী!" শুভা শিহরিয়া উঠিল। বর আবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, অতিশয় মাতব্বরী চালে বলিতে লাগিলেন "এইত সব কাঁচা, সব কাঁচা বিদ্যে! সাধু ভাষার সতীনকে বলে 'সৎপত্নী' "সপত্নী" নয়! ছেলে বল্‌বে 'সৎমা' সতীন বল্‌বে 'সৎপত্নী'। এ বাবা পাণিনির নিয়ম! আগাগোড়া বাঁধা!"

মামাবাবু আনীত বরের বিদ্যা দেখিয়া অবাক্ লাগিতেছিলেন কিন্তু ঘরে তিনটী সতীন থাকার দরুণ মা নাকি এমন ধনবান্ বিদ্বান্ বরটীকে ফিরাইয়া দেন, সেই আশঙ্কায় শুভার ভবিষ্যতের বন্দোবস্ত বর্ত্তমানেই জামাতা দ্বারা সর্ব্ব সমক্ষে কায়েমী করিয়া লইবার মতলবে ভাবী জামাতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"আহা বাবা আমার বৃহস্পতি এমন বর মেলেনা যতীন্। তবে এই যা"—বর বাধা দিয়া সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, "কুচপরোয়া নেই মামা বাবু! বলেন তো বিয়ের আগেই সেই তিনটা জানোয়ারকে দেশ ছাড়া করে দিই! ওদের বাপ্ ভাইরা কিছু কিছু টাকা পয়সা দিয়ে জমিদার জামায়ের ম'নরক্ষা করে বলে আজও ঘরে রেখেছি!—কি বল হে?"—সঙ্গীটী একটু কাসিয়া একটু হাসিয়া "আজ্ঞে হুজুর 'মহারাজ' ইত্যাদি বলিয়াই দুই তিনবার মাথা ও হাত নাড়িয়া চুপ করিয়া গেল। মেজদা কষ্টে হাস্য সংবরণ করিতেছিলেন, মামাবাবুর পরম উৎসাহ! আমি লক্ষ্য করিতেছিলাম, এই পশুটার লুব্ধ দৃষ্টির সামনে নিজেকে ধরিয়া রাখা শুভার পক্ষে ক্রমেই অসাধ্য হইতেছিল, আমি ডাকিলাম বরের বাধা দেওয়া সত্বেও সে উঠিয়া আসিল, মামাবাবু বরের সঙ্গে মোটরে চাপিয়া অদৃশ্য হইলেন, মেজদাকে শুনাইয়া শুনাইয়া শুভা অশ্রুগদগদ কণ্ঠে কহিল,—"ইন্দু তোরা আমায় কাশী রেখে আয় নয়ত কেটে ফেল"। জমিদার বরের জন্য দরজা বন্ধ হইয়া গেল।

* * * * *

পরদিন আমার পাণিগ্রহণের জন্য আসিলেন একজন এম্, এ। বাড়ীশুদ্ধ একটা কৃতার্থতার স্বস্তি ভরিয়া উঠিল, সকলেই মহাখুসি, বর আমাকে

বেশ করিয়া দেখিলেন, ডবল পাওয়ার চসমার সাহায্যে আমার আপাদ মস্তক লক্ষ্য করিয়া খুটিয়া খুটিয়া সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সন্ধান লইয়া তবে কথা কহিলেন,—"তোমাব নাম?"—নাম বলিলাম। প্রশ্নের উত্তরে নির্লজ্জার মত গুণের পরিচয়ও দিতে হইল। এসকল বিষয়ে সন্তুষ্ট হইলেন বলিয়াই মনে হইল, কিন্তু উঠিবার সময় বলিয়া গেলেন,—তিনি দরিদ্র, ঋণ করিয়া পাশ দিয়াছেন, দু'টী অনূঢ়া বোন্‌কেও পার করিতে হইবে, সুতরাং পাঁচ হাজার নগদের কমে তাঁহার মাতা ও বৌদিদি নাকি মানিবেন না। মেজদা বিবেচনা করিয়া উত্তর দেওয়ার কথা বলিয়া আপাততঃ বিদায় করিয়া দিয়াছেন।

* * * * *

দু'দিন বাদেই মামাবাবু কথা নাই বার্ত্তানাই কোথা হইতে আর একটা শীকার ধরিয়া আনিয়া হাজির করিয়াছেন, লোকটা নাকি 'টাকার কুমীর' বয়স কত বুঝিবার জো নাই, তবে ষাটের নীচে হইবে না, মাথায় একটা চুল নাই, দাঁত গুলার দুপাটীই বাঁধানো, বরটী বেশ গৌড়, পাকা আমটীর মত স্থূল দেহ ভারটা, কোন প্রকারে কেদারার বুকে চাপাইয়া দিয়া বৃদ্ধ হাপাইতে ছিলেন। তাও অতি সন্তর্পণে, তাই পরিশ্রমও কিছু বেশী হইতেছিল, বৃদ্ধ ঘামিয়া গেলেন, আমি 'ফেন্' টিপিয়া দিলে বৃদ্ধ আহা আহা করিতে লাগিলেন, আবেশে তাহার চোখ দু'টী বুজিয়া আসিতেছিল, অনিচ্ছা সত্বেও মামাবাবুর টানাটানিতে শুভা আসিয়া বৃদ্ধের সম্মুখে দাঁড়াইল, বৌদি শুনিয়া হাসিও না সেদিন ভারি মজা হইয়াছিল, হঠাৎ বৃদ্ধ চোখ মেলিয়া চাহিয়াই সাম্‌নে শুভাকে দেখিয়া

একেবারে চম্‌কিয়া উঠিলেন, হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন,—"আহা কি অপূর্ব্ব রূপ, সাক্ষাৎ মা দুর্গার প্রতিমে!" বৌদি, শুভাত শুনিয়াই এক দৌড়, আমি হাসিতে হাসিতে কাঁদিয়া ফেলিলাম, ঘর শুদ্ধ একটা চাপা হাসি, বৃদ্ধ কাসিতে কাসিতে উঠিয়া গেলেন। মেজদা, মামাবাবুকে বর দেখাইতে একদম নিষেধ করিয়া দিলেন।

*   *   *   *   *

এবারে আসিলেন একজন সংস্কারক গ্রাজুয়েট্! নিঃসহায় মেয়েদের 'পার' করা নাকি তাঁর জীবনের ব্রত। শুনিয়া খুসী হইলাম, কিন্তু কনে দেখিবার ধরণ দেখিয়া মনটা যেন কেমন চটিয়া গেল। শুভাকে পুলিসের নজরে পরীক্ষা করিয়া করিয়া বাবুটী বলিলেন,—"হ্যাঁ চল্‌তে পারে!" মেজদাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"যতীন্ বাবু, আপনি আমাকে অবশ্যই জানেন, শুধু বাংলার এই দরিদ্র অভাগিনীদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে আমি এই সংকল্প নিয়েছি। আমার পৈতৃক অবস্থা ভাল নয়, সুতরাং বিয়ে করে আপাততঃ খোরপোষ চালান কঠিন। তাছাড়া বিয়ের খরচ বাবত ও কতকটা টাকা আমায় না দিলে চল্‌বে না। প্রতিজ্ঞা করেছি পণ বা যৌতুক সামগ্রী নেবনা—তা পণ চাই না, এটা বিয়ের খরচ, আর যৌতুকসম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য নাই, তবে দিলে, আপনার সম্ভ্রম রক্ষার জন্য না নিয়ে পারব না, কি বলেন? কনে গরীবের মেয়ে হলেও আপনার মত সম্ভ্রান্ত লোকের আত্মীয় আপনার বাড়ী থেকেই বিয়ে হচ্ছে, আপনিত আর নিজের সম্ভ্রম নষ্ট করবেন না? যেমন তেমন হলেও গহনাতে যৌতুকে দু'তিন হাজার নেমে যাবে! না, কি

বলেন যতীন্ বাবু? অনুমান ঠিক্ নয় কি?" বলিয়া মেজদার মুখের দিকে আশান্বিত নেত্রে তাকাইয়া একটু হাসিতে চেষ্টা করিলেন। মেজদা —নীরব রহিলেন, গ্রাজুয়েট্ সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন,—"এত আর বেশী নয় যতীন্ বাবু.—আমি যদি পণ নিতুম বোধ হয় সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচ সাত হাজারের দাবী করে আদায় করতুম, এত শুধু দয়া, বাংলার দুর্নীতি দূর কর্‌বার জন্য আমরা ক'জন মাত্র আত্মবিসর্জ্জন করতে প্রস্তুত হ'য়েছি! আহা অভাগিনীর জাতিরে!" বাবার সঙ্গে বুঝিয়া উত্তর দিবার ওয়াদা লইয়া মেজদা গ্রাজুয়েট্ বরটীকে বিদায় করিলেন।

* * * * *

শ্রাবণ মাস যায় যায়। এই—ক' মাসে শ্বশুরের দল অনেক আসিয়াছেন। আমাদের দুটী বোন্‌কে তাঁহারা স্নেহের দৃষ্টিতেই দেখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু টাকা পয়সা ও গহনা যৌতুকের ফর্দ্দ লইয়া তোমাদের "বাংলার রাণীর" দলের সঙ্গে দারুণ মতানৈক্য হেতু তাঁহারা নিজেদের আগেকার কথা রক্ষা করিতে না পারিয়া লজ্জায় আর এমুখো হন নাই। শুভার মত মেয়েকে বৌ করিতে পারিলেন না বলিয়া অনেকে নাকি আপ্‌শোষ করিয়াছেন শুনিলাম! কি করিবেন তাঁহারা, ঘরে যে 'বাংলার রাণী'র দলের অখণ্ড প্রতাপ!

তোমাদের 'রাণীর' দলও পাঁচ সাতটী না আসিয়াছেন এমন নহে। কখনও স্বরূপে কখনও বা প্রতিবেশিনীরূপে, কিন্তু পোড়া চোখ্‌কে ফাকি দেওয়া কঠিন! বৌদি, এই পাঁচ বৎসরের অভিজ্ঞতায় এতটুকু বুদ্ধি আমার হইয়াছে যে আমি একনজর দেখিয়াই বলিয়া দিতে পারি,

তোমাদের বাংলার কোন্ রাণীটী বিবাহযোগ্য নব্য বঙ্গের জননী, বৌদি সে ভাবভঙ্গী, সে চাল চলন, এত স্পষ্ট যে তা একটু নজর রাখিলেই চোখে ঠেকে! এক দিনের কথা শোন, প্রতিবেশিনীরূপে একজন 'বাংলার রাণী' শুভাকে পসন্দ করিয়া করিয়া হঠাৎ বলিয়া বসিলেন, "আহা দিব্যি মেয়ে দোষ মাত্র দু'টী—কেউ নেই গরীব, আর রংটাতে যদি আরও একটা দুধে আল্তার পোছ্ থাক্তো!"—শুভার রংয়ের দোষ ধরা একটা অপরাধ বলিয়াই আমার মনে হয়। আমি আর থাকিতে পারিলাম না, মুখের উপর বলিয়া ফেলিলাম, 'হ্যাঁ মা, ঘরে শাশুড়ী বুঝি খুব কাল, তাই বৌকে দিয়ে পুষিয়ে নিতে চান্?" বলা বাহুল্য প্রতিবেশিনীরূপিণী শাশুড়ীটী আবলুষের মত কাল। আর যা—চেহারা!—রামঃ।—কিন্তু উপায় নাই।—

এই কথাটাই এখন ভাবিবার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। "উপায় নাই?" কেন? জগতের ব্যাপারে স্ত্রীপুরুষের স্থান পাশাপাশি। যাহাকে সংসার নামে নির্দ্দেশ করা হয়, সেখানে এ দুইই সমান। স্ত্রী-পুরুষের কাহাকেও বাদ দিয়া কাহাকেও চলিবে না। এদু'য়ের মিলন সৃষ্টির আদি কারণ প্রকৃতিপুরুষ বা শিবশক্তির মিলনের মতই সত্য এবং অবশ্যম্ভাবী, শুধু তাই না উহা সত্য, শিব এবং সুন্দর! যদি তাহাই হয় তবে নারীর প্রতি অন্ততঃ এই বিবাহ ব্যাপারের চিরমিলনের প্রথম সোপানে এই ঘৃণা উপেক্ষা অনাদর কেন? বৌদি আমরা এতনীচ এতই হীন হইয়া পড়িয়াছি যে বাজারের ফলমূলের মত ঝাকা বোঝাই —হইয়া দিনরাত বসিয়া আছি, মুনিবের জাতি আসিবেন, খুসি মাফিক নাড়িয়া চাড়িয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া পরখ করিবেন, পসন্দ হইলে

তবে বিক্রীর কথাবার্ত্তা। তাও দেখ কি চমৎকার ব্যবস্থা, যাঁহারা কিনিয়া লইবেন তাঁহারা এক পয়সাও দিবেন না, কিন্তু আমরা এমনি অনাবশ্যক জিনিষ যে আমাদের বিক্রী করিতে হইলে বাপ্‌মাকে ভিটা বাড়ী খোয়াইয়া ক্রেতার পায়ে তোড়ার তোড়া ঢালিয়া দিতে হইবে, নইলে আমাদের কেউ কিনিবে না। কাহারও যেন কিছুই দরকার নাই, হা বৌদি, এই অনাবশ্যক অনূঢ়ার দলকে রাতদিন পুরুষের সাম্‌নে অপমানিত করিয়া সমাজের কি লাভ বলিতে পার? আমাদের যতটা দেখিয়া লইতে চেষ্টা করা হয়, আমাদের বাপ্‌ ভাইরা বরের দিকটা ততটা দেখিয়া লইতে সাহস পান কি? ঘরে আঁবকাঁঠালের গাদা জমিলে দোকানদারকে পঁচিয়া যাইবার ভয়ে যেমন তেমন দরে বিক্রী করিয়া ফেলিতে দেখিয়াছি, তবু তাহারও একটা দর আছে, আর এই বাংলায় অনূঢ়ার দল কি এতই ঘরে গাদা লাগিয়া পঁচিয়া যাইতেছে যাহার জন্য ঘরের টাকা দিয়া গুদাম পরিষ্কার না করিয়া উপায় নাই? বৌদি, কথাটা একবার ভাবিয়া দেখিবে কি? যাহার টাকার দরকার, না হইলে চলেনা, সে বরং টাকা চাহিলে কতকটা সহ্য হয়, কিন্তু এই বাংলার সংস্কারকদলের 'দয়া'র কাঁদুনী সত্য সত্যই অসহনীয়! তুমি 'দয়া' করিয়া 'কনে' পার করিবে?—কেন? তোমার 'দয়া'র কি অধিকার আছে সংস্কারক? কে তোমার দ্বারে দয়ার প্রার্থী? যে জিনিষ না হইলে তোমার চলিবে না, তোমার বংশের ধারা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে, যাহাকে মাথায় করিয়া ঘরে লইয়া যাইবার জন্য তোমার সারা সংসার আকুলি বিকুলি করিতেছে, তাহাকে 'পার' করিবার জন্য

'আত্মবিসর্জ্জন' করিয়াছ বলিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করিতে লজ্জা করে না তোমার? 'দয়া'? বৌদি, এই দয়ার ক্রীতদাসী হইয়া তোমাদের 'বাংলার রাণী'র দল বেশ 'রাণীগিরি' করিয়া যাইতেছেন। আর তাহাদের লজ্জাহীনতা ও নির্দ্দয়তার পেষণে আমাদের অর্দ্ধেক অস্থি চূর্ণ হইয়া যাইতেছে।

'মিশ্রিত নির্ব্বাচনে'র কথা একবার উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি, কথা-টার মর্ম্ম এই যে আগেকার দিনেও মিশ্রিত নির্ব্বাচন ছিল বটে, কিন্তু তাহার ধাত ছিল অন্যরূপ, আর এখনকার মিশ্রিত নির্ব্বাচনের ধাতই স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছে। এখন দেখিতে পাই 'কনের রূপ' 'শ্বশুরের অর্থ' 'বরের রুচি' আর বাংলার রাণীর দলের 'গহনা যৌতুক' এই ক'টার মিশ্রণে পাত্রী নির্ব্বাচন হইয়া থাকে। আগেকার দিনে ঘটক গুরু পুরোহিত ও বাপ্ ভাই ইঁহারা সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া উভয়তঃ কুল-শীল বংশ ও পরিবারের পবিত্রতা বর ও কনের রূপগুণ এসকল দেখিয়া শুনিয়া সম্বন্ধ স্থির করিতেন। আর ফলও বোধ হয় ভালই হইত, অন্ততঃ একটা ফল এই হইত যে আমাদের নিজের দেহটা লইয়া এত হেনস্তা হইতে হইত না। আমার সব চাইতে এইটাই বেশি লাগিতেছে যে এই এক এক দিনের দেখার মধ্যে আমাদিগের বুঝিয়া লইবার বা চিনিয়া লইবার সম্ভাবনা না থাকা সত্ত্বেও ইহারা আমাদের দেহটা লইয়া রূপটা লইয়া বা রূপেরই মত নেহাৎ খেলো বাহিরের জিনিষ গানটা বাজনাটা বা শিশুতোষের বানান্টা লইয়া এত প্রয়াস করিয়া মরেন কেন? ইহাতে আমাদের যথার্থ রূপগুণের বা বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় ঘটে কি? মানসিক

বৃত্তির উৎকর্ষ অপকর্ষ ধরিয়া লইবার সুবিধা হয় কি? হা আমার কপাল, উহারা কি 'মানসিক' লইয়া ব্যস্ত? উহারা যেমন শিক্ষা দীক্ষার প্রভাবে তরল রুচি বিকারগ্রস্ত অথচ অহঙ্কারী, তেমনি আমাদের রূপ আর 'কলার' সন্ধানেই উহারা চরিতার্থ হইয়া থাকেন। কিন্তু শুনিয়াছি এই 'কলান্বেষীর' দলের ভাগ্যে প্রায়ই কদলী লাভ ঘটিয়া থাকে, তবে কদাচিৎ পক্ক কদাচিৎ বা অপক্ক!

তোমাদের নব্যবঙ্গ বাংলার নারীগণের অভাব ও দুঃখ মোচন কল্পে কতটা অগ্রসর তাহার চেহারাটা নারীসংগ্রহের প্রথম সোপানেইত দেখিয়া লইতে পারিতেছি। সুতরাং আত্মপ্রতারক মাতা ভগিনীর জাতের অবমাননাকারী এই দলের প্রতি আমার আর বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস নাই। ইহারা আমাদের সম্ভ্রম ও ব্যক্তিত্ব লইয়া যেরূপ নীচ ব্যবহার করিয়া চলিয়াছেন, আমি মরিয়া যাইব বৌদি, তবু এই শ্রেণীর বরের গলায় মালা দিতে পারিব না। দাদাকে বলিও তিনি যেন সিমলা হইতে তারের উপর তার করিয়া বাবাকে আর মেজদাকে বিব্রত করিয়া না তুলেন, আজ এই পর্য্যন্ত। চিঠির উত্তর শীঘ্র পাঠাইবে। অনেক বকিলাম মাপ করিও! ইতি—

সেবিকা—

সখী ইন্দু।

বৈরাগীর বন্ধন !

(১)

"দেহিমে আনন্দ আমার আহ্লাদিনি,
(আমার) এই বাসনা রাধা দিওনা তায় বাধা,
—ঘুচাও মম ক্ষুধা, সুধা তরঙ্গিনি"—

চা'য়ের বাটীতে চুমুক দিতে দিতে শুনিলাম বাহিরের দ্বারে খঞ্জনীর সুরে সাধাগলা মিলাইয়া আমাদের যুগলদাস বৈরাগী-কণ্ঠের কৃষ্ণলীলা আরম্ভ করিয়াছে। সকালবেলা তাহার এমন গান আমরা প্রায়ই শুনিতাম, সে ভিক্ষায় বাহির হইলে আমাদের দরজায় একবার না আসিয়া যাইত না। আমি কলেজের ছাত্র হইলেও ছেলেবেলাকার বন্ধুতার ক্ষীণ সূত্রটী আজিও ছিন্ন করিতে পারিতেছিলাম না। যুগলদাস এখন পূরা দস্তুর খঞ্জনীজীবী হইলেও বাল্য সৌহৃদ্যের পবিত্র স্মৃতিখানি যত্ন ও গৌরবের সহিত সর্ব্বদা জাগাইয়া রাখিতে শৈথিল্য করিত না, যুগলদাস গালভরা হাসি, প্রাণভরা আনন্দ ও কণ্ঠভরা সঙ্গীত লইয়া তাহার বাল্যসখার দুয়ারে প্রায় প্রত্যহ সকালবেলা আসিয়া হাজির হইত। আমার সঙ্গে দুইচারি কথা আলাপ না করিয়া সে যাইতে চাহিত না। আমি তাহাকে চা খাইবার জন্য অনুরোধ করিতাম কিন্তু যুগলদাস সম্মানের সহিত সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিত। সেই প্রত্যাখ্যান পদ্ধতিটি এত সহজ সরল এবং বিনয়গর্ভ যে তাহার পরেও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেটী হৃদয় জুড়িয়া বসিয়া থাকিত; স্নিগ্ধ আনন্দরসে চিত্ত আপ্লুত হইয়া উঠিত, বৈরাগীর সন্তান যুগলদাসকে, সভ্যতার আদর্শ বলিয়া অনেক সময় মনে না হইয়া যাইত না।

যুগলদাসের বয়স এখন প্রায় ১৮ বৎসর, তাহার সদা প্রফুল্লচিত্তে এখনও কাল দাগটুকু পড়ে নাই। সে তাহার বৈরাগী বৈষ্ণবী মাতা পিতার একমাত্র সন্তান; যুগলদাস এখনও কণ্ঠী বদল করে নাই। তাহার মাতা পিতা নেড়া নেড়ী দলের সর্দ্দার গোছের একটু সম্পন্ন গৃহস্থ। তাহারা ইচ্ছা করিলে যুগলদাসের গলায় এই ১৮ বৎসর বয়সেই পাঁচটা সাতটা বৈষ্ণবী জুটাইয়া দিতে না পারিত এমন নহে, কিন্তু কেন জানিনা যুগলদাস আজিও সেই পথের পথিক হয় নাই। যুগলদাসকে দে'খতে বেশ বলিষ্ঠ চতুর ও স্থির ধীর দেখাইত। তাহার বড় বড় চোখ দুইটীতে স্নেহ মমতা বুদ্ধিমত্তা ও সরলতা ভাসিয়া বেড়াইত। যুগলদাসকে যে একদিন দেখিয়াছে, যে তাহার মধুর সঙ্গীত একবার শুনিয়াছে, সেই তাহাকে একটু স্নেহ না করিয়া পারে নাই, তাহাকে ভুলিতে অনেকদিন কাটিয়া যায়। যুগলদাস গান শেষ করিয়া বলিল—"একটা খোশ খবর এনেছি সুশীলবাবু, আজকে বকৃসিস আদায় না করে কিন্তু ছাড়্‌ছিনি।" হাসি আনন্দ ও ঔৎসুক্য তাহার আপাদ মস্তকে একটা তরঙ্গ তুলিয়া গেল, আমি তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলাম "কি রকম ভাই যুগল?" সে কহিল "সুশীলবাবু ভেবে দেখুন মাসখানি আগে সেই যে গঙ্গার ধারে একজন মড়াখেকো সাধু এসেছিল? এই যাকে দেখবার জন্য একক্রোশ চড়্‌ভেঙ্গে শেষ্‌টায় হতাশ হয়ে ফিরে এসেছিলাম।" আমি আগ্রহ সহকারে বলিলাম "হাঁ্যা হাঁ্যা, ভাই সেই যে অশ্বথ তলায় বসে আধঘণ্টা হাঁফিয়েছিলাম ঠিক মনে আছে—বল দেখি ভাই তার কি কোন সংবাদ আছে?" এইবার যুগলদাস বড় বড় দু'টী চক্ষু আমার মুখের উপর

স্থাপিত করিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া হাসিয়া বলিতে লাগিল "তা না থাক্‌লে আর বৈরাগীর ছেলে দুটী ভিক্ষের বদলে বক্‌সিস্‌ দাবি করে সুশীলবাবু? সে কাল সন্ধ্যার সময় আমাদের বাগানে এসে আস্তানা করেছে একবারে সশরীরে।" আমি হঠাৎ লাফাইয়াই উঠিতেছিলাম, কোঁচাটায় হাঁটু আটকাইয়া বেগটা একটু থামাইয়া দিল, কিন্তু কাপড়খানা হাঁটুর দিকে ফাটিয়া গেল দেখিয়া আমি একটু লজ্জিত হইয়া পড়িলাম—যুগলদাস বলিল "ব্যস্ত হবেন না, সুশীলবাবু, সে এসেছে, আছে, এবং আরও কিছুকাল থাক্‌বে হয়ত। এই বাগানেই তার শেষ নিশ্বাস বের হয়ে যাবে না তাইবা কে বল্‌তে পারে? এখন সুবিধা হবে না, বিকাল বেলা যাবেন, বেশ মজা হবে এখন;" হঠাৎ বাধা পড়িয়া যাওয়ায় এ বেলাকার জন্য মনের ঔৎসুক্য মনেই চাপিয়া রাখিয়া শেষবেলার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, যুগলদাস হাসিমুখে গৃহান্তরে ভিক্ষার জন্য চলিয়া গেল। যুগলদাস যদি যথার্থ বক্‌সিসের আকাঙ্ক্ষী হইত, আমি খুসী হইয়া তাহাকে বকসিস্‌ করিতাম; সেত সেই ধাতের লোক নয়, যাক্‌ যুগলদাসের কথার মধ্যে যেন আরও একটা কি গুপ্ত ইঙ্গিত ছিল। আমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছিনা বটে, কিন্তু এই ঝড়া-থেকর বাগানে আগমনের এবং অবস্থানের মধ্যে একটা যেন গূঢ় রহস্য বর্ত্তমান রহিয়াছে, যুগলদাস যেন তাহাই আমাকে আভাসে জানাইয়া গেল। ঠিক্‌ ধরিতে পারিলাম না কতক্ষণে সেই অদ্ভুত সাধুর দর্শন লাভ করিয়া তাহার সম্বন্ধে সকল রহস্য অবগত হইতে পারিব, ভাবিয়া ভাবিয়া অস্থির হইয়া উঠিলাম। এমন ঔৎসুক্য বোধ হয় ইতঃপূর্ব্বে আর কখনো হয় নাই পরীক্ষার ফল জানিবার জন্যও নহে। নববধূর মুখ দেখিবার বা কথা শুনিবার জন্যও নহে!

(২)

তথনো সন্ধ্যা হইবার ঘণ্টাখানেক দেরী আছে, কিন্তু ঔৎসুক্য আমাকে একেবারে পাইয়া বসিয়াছিল, আমি নিয়মিত দিবানিদ্রার পূর্ণসুখটুকুও সেদিন উপভোগ করিতে পারি নাই; শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলাম আর সেই অদ্ভুত চরিত্র সাধুর কথাই ভাবিতেছিলাম। মাঝে মাঝে একটু তন্দ্রাও আসিতেছিল, তন্দ্রাবসানে একবার দেখিতে পাইলাম আমার লজ্জাবতী নব সঙ্গিনীটী শয়নগৃহে একটু চুপি দিয়া আমাকে অন্যমনা দেখিতে পাইয়াই সত্বরপদে গৃহান্তরে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছেন, ভাবিলাম ডাকিয়া একটু কথা কই কিন্তু শাশুড়ী ননদীর নজর এড়াইবার জন্য চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টিপাত করিতে করিতে তিনি ততক্ষণ কোন রাজ্যে চলিয়া গিয়াছেন, আমার জড়িত কণ্ঠের সতর্ক চাপাস্বর তাঁহার কানেই হয়ত পৌঁছে নাই। ভারি বিরক্তি ধরিয়া গেল; উচ্চ কণ্ঠে ছোট বোন 'বিনি'কে ডাকিলাম, সে অধরপ্রান্তে একটুকরা চাপাহাসি লইয়া তাড়াতাড়ি ঘরে আসিয়া আমার বৈকালিক বেশ ও জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া দিল। জলযোগের পর মুখে একটা পান গুজিয়া একগাছা ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে এদিক ওদিক চাহিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া একেবারে ভাগীরথীর তীরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। তথনো সন্ধ্যা হয় নাই কিন্তু পশ্চিমে সূর্য্য দূরের তাল ও খর্জ্জুর বৃক্ষের উচ্চশিরে সোনার মুকুট—পরাইয়া দিবার জন্য বিচিত্র কিরণজাল বিস্তার করিতেছিলেন। আকাশ প্রান্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড লইয়া সূর্য্যরশ্মি আর বৈকালিক উদ্দাম পবনের মধ্যে খেলা চলিতেছিল। ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে আমের বন ও বাঁশের ঝাড়ের উপরে অনেকগুলি পাখী কলরব করিয়া উড়িতেছিল, এবং বসিতেছিল,

সূর্য্যের ডুবিবার আরও দেরি আছে কি না, যেন দলে দলে উড়িয়া উড়িয়া তাহাই দেখিতেছিল। ঈশৎ স্বর্ণাভ সূর্য্যরশ্মি ভাগীরথীর তরঙ্গ চঞ্চল বক্ষে পড়িয়া স্বপ্নজাল বুনিতেছিল। দূর পল্লীর রমণীগণ তাড়াতাড়ি জল তুলিয়া গৃহে ফিরিবার জন্য ব্যস্ততা সূচক বাক্যাবলী উচ্চারণ করিতে করিতে মন্থর পদেই গৃহাভিমুখী হইতেছিল, দূরে একখানি বড় নৌকা "অমল ধবল পাল" তুলিয়া দিয়া নাচিয়া নাচিয়া যাইতেছিল, তাহাদের দাঁড়িগণ দাঁড় তুলিয়া পূরা বিশ্রাম করিতেছিল, আর পশ্চাতে মাঝি মহাশয় হালে ধরিয়া একমত চোখ বুজিয়াই পাড়ি জমাইতেছিলেন। কেবল মাঝে মাঝে দাঁড়িদিগকে তামাক সাজিয়া তাঁহার মুখের কাছে ধরিবার জন্য অনুযোগ-মিশ্রিত ফরমাস দিতেছিলেন। দাঁড়িদের বিশ্রামটা যেন মাঝি মহাশয়ের সহ্য হইতেছিল না। গঙ্গার ধারে ভ্রাম্যমান আরও দুই একটী বন্ধুর—চোখ এড়াইয়া আমি অনতি দূরে অবস্থিত সাধু-সন্ন্যাসীর আশ্রম-স্থান যুগলদাসের কথিত সেই বাগানে যাইয়া একেবারে যুগলদাসের পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম।

আমাকে দেখিয়া যুগলদাস একটু সম্ভ্রম-সংকুচিতস্বরে কহিল "সুশীল-বাবু,—এই এতক্ষণ আপনার কথাই ভাবচি—এই দেখুন সেই"—এই বলিয়া কিছুদূরে একটী নিমগাছের গোড়ায় ক্ষুদ্র কুটীরের দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিলে আমি বেশ দেখিতে পাইলাম, একটা রুগ্ন শুষ্ক পিশাচ প্রতিম নরাকৃতি আমাদেরই দিকে উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে। আরও দুই পা অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, অদ্ভুত সাধুটীর পরিধানে এক-খণ্ড ছিন্ন মলিন বস্ত্র, গলায় কোনও মালা নাই, কপালে কোন সম্প্রদায়

চিহ্ন তিলক বা ফোটা নাই, চুলগুলি রুক্ষ, উপরের দিকে সজারুর কাঁটার মত নিছক খাড়া, দাড়িগোঁপ স্বল্প হইলেও ক্ষৌর সম্পর্ক-শূন্য, চোখদুটা সাদা হইয়া গিয়াছে, এই বিষণ্ণ দীন ও নিতান্ত নীচ-শ্রেণীর জীবটিকে আমার কিছুতেই সাধু বলিয়া বিশ্বাস জন্মিল না, আজ সকালেই সে বাগানে পদার্পণ করিয়াছে বলিয়া আস্তানাটা গুছাইয়া লইতে পারে নাই। তবে কুটীরের একদিকের চালের কোনে একটা, রাঁধিবার হাঁড়ি শিকায় ঝুলিতেছিল, তাহার দিকে সতর্ক অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া যুগলদাস সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিল যে সাধু এই হাঁড়িতে করিয়াই মড়ার মাংস খাইয়া থাকেন,—এবং এই হাঁড়িটা সাধুর সঙ্গে বরাবরই নাকি থাকে, যুগলদাস বিস্মিত নেত্রে আমার দিকে তাকাইয়া কিঞ্চিৎ নৈরাশ্যের ভাবে কহিয়া উঠিল, "সুশীলবাবু, সময় মত এলে আমি আপনাকে হাঁড়ির ভিতরটাও বোধহয় দেখিয়ে দিতে পারতাম"; আমি একটু হাসিয়া যুগলদাসের হাতখানি ধরিয়া বলিলাম, "না ভাই আমি তোমাকে অবিশ্বাস করি নাই"। কাণেকাণে কহিলাম "তবে এ বেটা যে সাধু নয়—সে আমি দিব্যি করেই বল্‌তে পারি"। আর দুই পা আগাইয়া সাধুর খুব কাছে যাইয়া একটা পঁচা গন্ধে সহসা থমকিয়া দাঁড়াইলাম। সাধুর শরীর হইতেই হোক বা, হাঁড়ির ভিতর হইতেই হোক্ একটা মড়ার গন্ধই যে উঠিয়া আসিতেছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই রহিল না। এইবার যুগলদাস একটু গর্ব্বের সহিত কহিল, "সুশীলবাবু ভগবান কোথায় কি জিনিষ লুকিয়ে রেখেছেন তা কারুর বোঝবার যো নেই"। সে আবার আমার মুখের দিকে তাকাইয়া চোখ নামাইয়া লইল, আমি তখন কলেজের সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গসঙ্গী

অবিশ্বাস ও সংশয়ের সহিত আপনার মনে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলাম। যুগলদাস তাহার আভাস পাইয়াই বোধ হয় বেশি কিছু বলিতে সাহস পায় নাই,—কিন্তু আমি যতবার যুগলদাসের মুখের দিকে তাকাইয়াছি ততবারই লক্ষ্য করিয়াছি যুগলদাস যেন এই সাধুটার অদ্ভুত সাধনায় অতিমাত্র বিস্মিত ও ভক্তিযুক্ত হইয়া পড়িতেছে। যুগলদাসের বড় বড় চোখদুটী যেন আমাকে বারে বারেই বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছিল "ওগো অবিশ্বাস করিও না, ভগবান কোথায় কি ভাবে কাজ করিতেছেন কে জানে" ?

সাধুর সহিত কথা কহিতে আগ্রহ হইল, কিন্তু যুগলদাস তাড়াতাড়ি জানাইয়া দিল, 'উনি কথা কন্ না'। হাসিয়া বলিলাম "বোবার শত্রু নাই"। যুগলদাস মুখ নীচু করিল. যেন লজ্জা ও দৈন্য তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে। যুগলদাসের সরল প্রাণে বিশ্বাসের যে দাগ বসিয়াছে তাহা ঘসিয়া মাজিয়া তুলিয়া দিবার ভার বিশ্ববিদ্যালয়ের মারফতে আমরা পাইয়া থাকিলেও এ ক্ষেত্রে সে কর্ত্তব্য পালন করিতে কি জানি কেমন বাধিয়া গেল।

সব কটা ইন্দ্রিয়ের শক্তি মাত্র দুটী চোখে সংহত করিয়া সাধুর আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিতে করিতে যখন সত্য সংগ্রহে যথার্থই ক্লান্ত হইয়া উঠিলাম, তখন দূরে একটী বালিকা যুগলদাসকে লক্ষ্য করিয়া নীচু স্বরে সংকোচের সহিত কি যেন বলিয়াই ছুটিয়া গেল, যুগলদাস বলিল "যাই—" আমি বালিকাটীর দিকে এই সামান্য অবসরে চোখ তুলিয়া যতটুকু তাকাইয়াছি তহাতেই একটা ধারণা হইয়া গেল যে মেয়েটী বেশ।

কিন্তু এই এক লহমার দেখায় যে রূপ-বর্ণনা করা একান্তই অসম্ভব, তাহাও আমার মনে হয় না। মেয়েটীর সুমুখের দিক্ যতটা না দেখিয়াছি পিছনের দিক্‌টা দেখিয়াছি অনেক বেশী, সেই লঘু গতি-ভঙ্গীর তালে তালে নর্ত্তনশীল পৃষ্ঠদেশব্যাপী কৃষ্ণকেশকলাপ মেয়েটীকে দস্তুরমত সুন্দরী করিয়া তুলিয়াছিল সন্দেহ নাই, মেয়েটী দেখিতে কাল, হাত পা ও শরীরের গঠন চমৎকার, মুখের ও চোখের গঠন তেমন ভাল করিয়া দেখিতে পারি নাই বটে, তবে চোখ দুটী যে যুগলদাসেরই মত বড়, ভাসা ভাসা, তাহা বেশ দেখিয়াছি। নাকটীও যে বাঁশির মত সরু আর মুখখানিও যে নেহাৎ খারাপ হইবে না, তাহাতে কিন্তু আমার সন্দেহই কিছু ছিল না। আমি প্রথম দৃষ্টিতে ভাবিয়াছিলাম একখানি কষ্টিপাথরের খোদাই মূর্ত্তি! সুর ও চেষ্টা আমার সেই ভুল ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল, সহসা যুগলদাসের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম সেখানে আনন্দ ও ব্রীড়ার সংমিশ্রণে একটা নূতন ভাবের খেলা চলিতেছে, যাহা সাধুদর্শনের বা আমার মত বাবু দর্শনের ফলে জন্মে নাই।

আমি বলিলাম "যাবে?" যুগলদাস বিনয়ের সহিত কহিল "হ্যাঁ সুশীলবাবু আপনাকে নিয়ে যেতে বাবা ডেকেছেন, দয়া করে"—আমি বাধা দিয়া কহিলাম, "হ্যাঁ ভাই যাব চল"। যুগলদাসের মুখ আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সাধুর কাছে নীরবে বিদায় লইয়া আমরা দুটী প্রাণী পূর্ব্বদৃষ্ট কিশোরীর গতিপথের অনুসরণ করিয়া চলিলাম।

বাগানটীর পরিসর অল্প নহে, আম জাম কাঁঠাল খেজুর নিম ও কদম্ববৃক্ষের সারি বাগানটীকে ছায়ামণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে। বৃক্ষ-

রাজির তলদেশ পরিষ্কার এবং স্থানে স্থানে ফাঁকা, সেই সকল ফাঁকা জায়গায় সাধু সন্ন্যাসীরা ছোট ছোট কুটীর বাঁধিয়া বাস করিয়া থাকে, কেহ কেহ বা দিনের বেলায় কেবলই খোলা গাছের তলায় আসন বিছাইয়া ধূনি জ্বালাইয়া সাধন ভজন বা তাহার অভিনয় করিয়া থাকে। রাত্রিতে তাহাদের আবাসস্থান কোথায় তাহা আমাদের অজ্ঞাত। বিশ্বাসী যুগলদাসকে জিজ্ঞাসা করিলে সে তাহার বড় বড় চোখ দুটী তুলিয়া পরম নিষ্ঠার সহিত বলিয়া থাকে, "সাধুগণ দিন রাত শীতে বর্ষায় এই গাছতলায়ই বাস করেন। তাঁহাদের কোনো কষ্ট নেই"। বলা বাহুল্য এই শ্রেণীর সাধুগণ যাযাবর! বেশি দিন একখানে থাকেনা, মেলা বা পর্ব্ব উপলক্ষে বেশ গুলজার করিয়া বসে, কিছুকাল থাকিয়া আবার চলিয়া যায়। এই বাগানে আরও এক শ্রেণীর সাধু সম্প্রদায় বাস করে তাহারা বৈষ্ণব। এই বৈষ্ণবশ্রেণীর সংখ্যাও অল্প নহে, বিশেষতঃ ইহারা যাযাবর নহে, চিরকালই ইহারা এইখানে বাস করে। যুগলদাসের বৈষ্ণব মাতাপিতা ইহাদেরই অন্তর্গত। যুগলদাসের বৈষ্ণবপিতা গৌরদাস বাবাজী একটু ভব্য গোছের বৈরাগী, বাগানের পশ্চিম প্রান্তে একটু বেশী স্থান জুড়িয়া গৌরদাসের গৃহ, এবং সেই গৃহ সংলগ্ন ছোট শাকসবজির ক্ষেত। গৌরদাস বাবাজীর ঘরে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ আছেন, দেবতার সেবা পূজা গৌরদাস নিত্য স্বয়ং সম্পাদন করিয়া থাকে, গৌরদাসের কএকটী বৈরাগী ও বৈষ্ণবী শিষ্য আছে, তাহারা গৌরদাসের সর্ব্বপ্রকার সেবা যত্নের সাহায্য করিয়া থাকে, এবং দিনের বেলা ভিক্ষা করিয়া ভিক্ষালব্ধ বস্তু গৌরদাসের ভাণ্ডারে তুলিয়া

দেয়। গৌরদাস তাহাদের দৈনিক প্রসাদের ও "বহির্ব্বাসের" ব্যবস্থা করিয়া দিয়া শিষ্যদিগকে বিষময় বিষয় চিন্তার হাত হইতে দূরে রাখিয়া যথার্থ গুরুর কার্য্য করিয়া থাকে। আমরা আস্তে আস্তে গৌরদাস বাবাজীর আঙ্গিনায় যাইয়া পৌঁছিলাম। বাবাজী বাহিরে আসিয়া আদর যত্ন করিয়া বসিবার জন্য কম্বল বিছাইয়া দিলে বসিলাম। গৌর-দাস বাবাজীর বয়স প্রায় ষষ্টি বৎসর, দেখিতে মোটা, গলায় ত্রিকণ্ঠী, পরণে শুভ্রবাস, সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের চিত্র বিচিত্র ছাপ, উন্নত নাসায় গিরিমাটীর তিলক সুরু হইয়া কপালের শেষ সীমা ছাড়াইয়া নেড়া মাথার প্রায় একচতুর্থাংশে যাইয়া ইতি করিয়াছে। তা করুক, গৌরদাস বাবাজীকে আমরা অবজ্ঞা করিতাম না, সে যে যুগলদাসের বাবা, শুধু এই কথাটা মনে হইলেই তাহাব প্রতি একটা শ্রদ্ধার ভাব আসিত। আমি এই গৌরদাস বাবাজীর বাড়ীতে আরও দুই একবার আসিয়াছি। যুগলদাসের সঙ্গে ছেলেবেলা একত্র পড়িয়াছি বলিয়া গৌরদাস আমাকে স্নেহ করিত। যুগলদাস পিতার দিকে তাকাইয়া কহিল, "মড়াখেকো সাধুদর্শনের জন্য সুশীলবাবু এয়েছিলেন"—গৌরদাস একটু হাসিয়া কহিল, "সাধুদর্শন হলো"? আমিও একটু হাসিয়া মাথা নাড়িলাম। একটু থাকিয়া গৌরদাস কহিল "বাবু যদি এলেন আমার যুগ্লার দাসীটাকে একনজর দেখে যান, এখনো কণ্ঠী বদল হয়নি, আস্‌ছে মাসে রাধারাণীর কৃপা হলে করবার ইচ্ছা"।

আমি বলিলাম 'বেশত' চকিত দৃষ্টিতে পাশে চাহিয়া দেখিলাম যুগলদাস অনেকখানি দূরে সরিয়া পড়িয়াছে। বাবাজী ডাকিল "চন্দ্রা,

চন্দ্রাবলি, একবার এসত মা এদিকে"। একটী কাল কিশোরী আস্তে কাছে আসিয়া ঢিপ করিয়া একটী প্রণাম করিল, গৌরদাস মেয়েটীকে হাতে ধরিয়া উঠাইয়া কোলের কাছে টানিয়া লইয়া কহিল, "বাবু এই চন্দ্রাকে আমি গঙ্গার ধার হতে সদ্য কুড়িয়ে এনেছিলাম, আজ এতটুকু হয়েছে"। আমি চাহিয়া দেখিলাম আমার আগেকার অনুমান ভ্রান্ত নহে। মেয়েটী কাল হইলেও অঙ্গসৌষ্ঠবে যথার্থ সুন্দরী। যুগলদাস ভাগ্যবান্ বটে! বাবাজীর মুখে চন্দ্রাবলীর অনেক গুণের কথাই শুনিলাম। মেয়েটীর উৎপত্তি ও পরিণতির মূলে এইরূপ সন্দিগ্ধ ও নিশ্চিত ব্যবধান না থাকিলে এই মেয়েটী যে কোনো ভদ্রঘরের শোভাবর্দ্ধন করিতে পারিত সন্দেহ নাই। চন্দ্রাবলীকে অনেকক্ষণ দেখিলাম, মেয়েটী ইতিমধ্যেই কএক বার ঘরে যাইবার জন্য উদ্যত হইয়াও বাবাজীর বাধা অতিক্রম করিতে পারে নাই, অগত্যা কাঠের মত শক্ত হইয়া খাড়া থাকিয়া থাকিয়া রজ্জুবদ্ধ গরুর মত নিজের প্রশংসাবৃষ্টি সহ্য করিতেছিল। এদিকে কথন সন্ধ্যা নামিয়া আসিয়া ঘনবনশ্রেণীর শ্যামচ্ছায়াতলে নিশীথের নিবিড় শয্যা বিছাইয়া গিয়াছে তাহা বুঝিতেই পারিলাম না। সহসা সন্ধ্যার কাঁসর ঘণ্টা বাগানের মধ্যভাগে এক সঙ্গে সাড়া দিয়া উঠিল, দূর হইতে যুগলদাস ডাকিল, "আসুন সুশীল বাবু, আপনাকে একটা নতুন জিনিষ দেখাব।" আমি উঠিলাম, গৌরদাস বাবাজী একটু গম্ভীর ভাবে বলিল "কি দেখবেন বাবু—আমরা একেবারেই গিয়েছি।" আমি কিন্তু তাহার কথায় তখন তেমন মনোযোগ দেই নাই। উৎকণ্ঠার সহিত দ্রুতপদে যুগলদাসের সঙ্গ লইলাম। যুগলদাস একটু যাইয়া আমার মুখের

দিকে ফিরিয়া চাহিয়া উৎসাহের সহিত কহিল,—"একদম নতুন সুশীলবাবু" "সে কি চন্দ্রার চাইতেও নতুন" ?—শুনিয়া যুগলদাস লজ্জায় মাথা হেট করিয়া আরও দ্রুতবেগে অগ্রসর হইল, আমরা সান্ধ্য আরতির—কেন্দ্র স্থানে যাইয়া দাঁড়াইয়া—দেবতা দর্শনের আশায় সুমুখের গৃহের দিকে চোখ তুলিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে যুগলদাসের কথার প্রতিধ্বনি হৃদয়ের মাঝে আপনা হইতেই বাজিয়া উঠিল, "হ্যাঁ নতুন বটে!" যুগলদাস কিন্তু ভক্তি ভরে প্রণাম করিয়া আঙ্গিনার ধূলা কপালে ও বুকে ঠেকাইয়া জিহ্বাগ্রে ছোঁয়াইতে লাগিল, আমি ত দেখিয়া স্তম্ভিত! দেখিলাম একখানা চৌচালা ঘরের চারি দিকে কাগজ ও পরদা লাগাইয়া ঘরখানা সাজাইয়া ঠিক মধ্যস্থানে একটা বড় লম্বা আসন পাতা হইয়াছে—সেটা পায়াকাটা চৌকিও হইতে পারে, মাটীর বেদীও হইতে পারে, যাহাই হোক আসন খানা পুরু গদীতে আঁটিয়া সাদা চাদরে বেশ করিয়া মুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এবং তাহারই মাঝখানে দুইটা মোটা তাকিয়ায় ঠেস দিয়া গোসাঞজী ও নব-সংগৃহীত বৈষ্ণবী-শক্তি যুগলরূপে উপবিষ্ট। বেদীর দুই দিকে দুই দল স্ত্রীপুরুষ ভক্ত খোল করতাল সংযোগে আরতির বাজনা বাজাইতেছে। ধূপাধারে ধূপগন্ধের সহিত ধূমজালে সারাবাগান আচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছে, কএকটী প্রদীপও জ্বলিয়াছে। দুইজন ভক্ত গোসাঞজী ও নবশক্তির অঙ্গে ব্যজন করিতেছিল, একজন ভক্ত আরতির অভিনয় করিতেছেন। আঙ্গিনায় তখন বাগানের অধিকাংশ সাধুর দল সমবেত হইয়াছে। আমিত একেবারে অবাক্ হইয়া গেলাম, হায় হায় মড়াথেকো সাধু দেখিতে আসিয়া এযে জ্যান্তথেকো সাধুর সশরীরে দর্শন লাভ করিয়া

ফেলিলাম। সহসা গৌরদাসের শেষ কথাটা মনের মধ্যে এক কিনারে উঁকি মারিয়া গেল, "আমরা একেবারেই গিয়েছি"।

গোসাঞ্‌জীকে আরও দুই একবার দেখিয়াছি বটে, কিন্তু তখন তাঁহার শক্তি ছিল না, এবং দেবলীলার এমন হাস্যকর আড়ম্বরও ছিল না, এত ভক্তবৃন্দেরও আনাগোনা ছিল না, এই কয়দিন হইল তাঁহার একটা ভাগ্যযোগ ঘটিয়াছে। গোসাঞ্‌জীর নাম প্রকাশ করিবার দরকার নাই। বয়স তাঁহার পঞ্চাশের কাছাকাছি মাথায় উন্নত জটাভার, দাড়ি নাভি-বিলম্বিত, হাতের এক একটা নখ ভেরেণ্ডার শিকড়ের মত বাঁকিয়া বাঁকিয়া গোটা হাতটাকে অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিয়াছে। গায়ে রঙ্গিন আলখোল্লা, বোধ হয় বসনের প্রয়োজনও তাহাতেই মিটিয়া গিয়াছে। গলার মোটা মোটা তুলসীব মালা, ভক্ত প্রদত্ত ফুলের মালারও অভাব নাই, গায়ে ফোটা তিলকের এত বাড়াবাড়ি যে দেখিলে হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হয়। গোসাঞ্‌জী ওষ্ঠপ্রান্তে একটু হাসিব রেখা টানিয়া নির্ব্বিকার ভাবে ভক্তের সেবা আরতি গ্রহণ করিতেছেন। আর নব-সংগৃহীত শক্তিটীর বয়স ত্রিশের কম হইবে না, দেখিতে চমৎকার সুন্দরী, গায়ের রং ফিট্‌-গৌর, নাক মুখ চোখ, দিব্য, ঘনকৃষ্ণ-কেশ-পাশ মাথার সুমুখের দিকে চূড়া করিয়া বাঁধা, একটা বেলফুলের মালায় সেই চূড়াটা আবার জড়ান; দেখিতে বেশ, গায়ে রঙ্গিন্ আলখোল্লা, কপালে তিলক, কণ্ঠে ভারে ভারে ফুলের মালা। মাতাজীর ওষ্ঠাধরে হাসির রেখা লাগিয়াই আছে। ভক্তগণ ঘন ঘন হরিধ্বনি করিতেছে—পাশে যুগলদাসের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, তাহার দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রু পড়িতেছে—এই

অশ্রুর উৎস যে যুগলদাসের ভক্তিপূর্ণ সরল চিত্ত, তাহার পরিচয় আমি মড়াখেকো সাধুর সাক্ষাতেও কতকটা পাইয়াছিলাম। সকালবেলা যুগলদাসের মুখে সাধুর প্রতি যে ভাবের মন্তব্য শুনিতে পাইয়াছিলাম, সাধুর সহিত কিয়ৎকাল একান্ত সাক্ষাতে যুগলদাসের সত্যকার সরলতা ভক্তির হাত ধরিয়া সহসা প্রকাশ পাইয়া বিকাল বেলায়ই তাহার মুখ হইতে অন্য কথা টানিয়া বাহির করিয়াছিল সন্দেহ নাই। যুগলদাস জাতবৈরাগীর সন্তান হইলেও তাহার হৃদয়ে কতকগুলি মহৎগুণ ছিল; স্নেহ প্রীতি দয়া সরলতা ও ভক্তি, এগুলি তাহার মধ্যে প্রায়ই আত্মপ্রকাশ করিত। ডোর কপীন পরিয়াও লোকে এমনতর ভণ্ডামি করিতে পারে, বা গাছের তলায় আস্তানা করিয়াও এমন বিলাস ব্যভিচারে গা ঢালিয়া দিতে পারে সেইরূপ বিশ্বাস পোষণ করিবার যথেষ্ট কারণ থাকা সত্ত্বেও কেন যে যুগলদাস তাহা একটী-বারও বুঝিতে পারে না, বা বুঝিতে চাহে না তাহা সেই সরল চিত্ত ভগবদ বিশ্বাসী যুগলদাসের অন্তর্য্যামীই জানেন। যুগলদাসের সঙ্গে বাক্যালাপ না করিয়া অতি সত্বর সেই অপবিত্র স্থান পরিত্যাগ করিলাম।

(৩)

বেলা সাতটা, বাহির বাড়ীতে যুগলদাসের খঞ্জনা তাহার মধুর কণ্ঠের সহিত সাড়া দিয়া উঠিল। যুগলদাস গান ধরিল—

"হরি তোমার মাতৃরূপ সর্ব্বরূপ সার।
ছেলে যখন "মা" "মা" বলে
বহে স্নেহে মায়ের অশ্রুধার"।

বৈরাগীর বন্ধন।

গানটা শুনিয়া বুকটা কেমন করিয়া উঠিল, গায়ে কাঁটা, চোখে জলের ভার নামিল!—সামলাইয়া লইয়া নির্ব্বিকার চিত্তের মত তাহার গান শুনিয়া গেলাম। গান শেষ করিয়া একটু হাসিয়া যুগলদাস কহিল—"সুশীলবাবু আপনি কাল আমার ওপর বিরক্ত হয়ে চলে এসেছেন!"

"ঠিক্ তোমার ওপর বিরক্ত হয়ে নয় তবে কালকার দৃশ্যগুলো আমায় যথার্থ বিরক্ত করে তুলেছিল, সাধুর পোষাক পরে এত ব্যভিচার"!

"সুশীলবাবু! কথাটা ঠিক বুঝ্‌তে পারলাম না। ব্যভিচার যাকে বল্‌ছেন সেটা হয়ত মিথ্যাও হতে পারে, এঁরা স্ত্রী পুরুষ নিজদের মধ্য দিয়ে ভগবানের মধুর ভাবের লীলারস বিলিয়ে যাচ্ছেন, এওত হতে পারে?"

"হ্যাঁ হতে পারে সবই। তবে কথাটা এই যে মোটা ব্যভিচারকে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার জোরে জন-সমাজে লোভনীয় করে তোলা বুদ্ধিমানের কাজ নহে, তা শিক্ষিত সমাজই—হোক আর অশিক্ষিত সমাজই হোক্"—

"সুশীলবাবু আমি মূর্খ, শিক্ষিত সমাজের কথা জানিয়া কিন্তু আমাদের এই অশিক্ষিত সমাজের লোকে কৈ এটাকে ত ঠিক ব্যভিচার বলে ধর্‌ছে না, বরং ভগবানের প্রত্যক্ষলীলা বলেই আনন্দভোগ কর্‌ছে। এতে যদি যথার্থই প্রাণে শান্তি আসে, ভাবে বুক ভরে যায়, আনন্দে চোখে বাণ ছুটে, দুদণ্ড অপার্থিব প্রেমে আত্মা বিভোর হয়, তবে দোষ কি এতে সুশীলবাবু? উপাসনার আদত উদ্দেশ্য ত আনন্দ লাভ?" "যুগল, 'সমাজ' বলে একটা জিনিস আছে, সেটা সব রকম মানুষ নিয়ে তৈরি,—মন্দের ভেতর দিয়েও ভালকে গ্রহণ করবার শক্তি গোটা সমাজের নেই,—থাকতে পারে না যুগল, কাজেই সমাজের বারোআনা লোকের কাছে

লোভনীয় আদর্শের অনুকরণ শিব গড়াতে গিয়ে বাঁদর গড়ার মত হয়ে যায়। "আনন্দ" ? আনন্দের নামে নীচ ইন্দ্রিয় সুখ ঢাক পিটিয়ে চলে যায়। ভগবানের লীলারসের অনুকরণ করতে গিয়ে এ দেশে মানুষের যেমন অধঃপতন ঘটেছে, এমন আর কোথাও ঘটে নাই"। আমাদের তর্ক শুনিয়া অন্য কোটা হইতে মামাবাবু আসিয়া তর্কের শেষ সূত্রটুকু পর্য্যন্ত ছিন্ন করিয়া দিয়া হাসির ফোয়ারা ছুটাইয়া বলিলেন, "আরে ভোলা আমার মামারে ! কলেজে আজকাল ধর্ম্মতত্ত্বেরও কাল্‌চার চল্‌ছে নাকি ?—গানটা শুন্‌ছিলাম বেশ,—তা কোথাকার সমাজ সমাজ করে সকাল বেলাটা মাটী করলে, বলি বাবাজী সমাজ কি আর আছে,—সেটাকে গঙ্গাতীরে গোর দেওয়া হয়ে গেছে অনেক দিন।"—

আমি কি একটা—বলিবার জন্য ভূমিকা ফাঁদিবার চেষ্টা করিতেছি দেখিয়া বুদ্ধিমান্ মামাবাবু একেবারে হাঁ হাঁ করিয়া মুখ চাপিয়া ধরিবার যোগাড় করিলেন, "আরে থাম, থাম, বাবা, মড়াখেক দেখবার জন্য কালকে নাকি কোথা গিয়েছিলে ? মড়াখেক দেখলে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ দেখলাম বৈকি" ?

"সেটা কি রকম ? দেখ্‌তে অসুরের মত বলিষ্ঠ, চোখ রাঙ্গা, উলঙ্গ, হাতে চিমটা, গলায় মড়ার হাড়ের মালা নয়" ?—

আমি বলিলাম, "এসকল কিছু নেই, শুষ্ক কাঠ, তবে চোক রাঙ্গা বটে"—

"ছাই দেখেছ"—বলিয়া মামাবাবু হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে যুগলদাসের মুখখানা লজ্জায় ম্লান হইয়া গেল। মামা বাবু এক শ্বাসে বলিয়া চলিলেন—

বৈরাগীর বন্ধন।

"তবে শোন সেবার মণিকর্ণিকার মহাশ্মশানে বাবাকে তুলে দিয়ে আমরা তিন ভাই একটু দূরে বসে ভবিষ্যৎ ভাবনায় নির্ব্বাক্ হয়ে পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করছি। আমাদের অনন্ত, আর কাশীবাসী দুইটী বন্ধু আরও একটু দূরে বসে হুঁকাকলকের তোয়াজ করছেন্—তখন রাত তিনটা হবে, দিব্যি জ্যোৎস্না, গঙ্গার জলে চাঁদের আলো পড়ে ঢেউয়ে ঢেউয়ে নাচছে; বাবার দেহের প্রায় অর্দ্ধেকটা পোড়া শেষ হয়ে গেছে, ঠিক এমনি সময়ে একটা কাল দস্যুর মত চেহারা নেংটা জটাজূটধারী মানুষ, হাতে একটা প্রকাণ্ড চিমটা একপা একপা করে মহাশ্মশানের ধাপ দিয়ে যেখানে শবদাহ হচ্ছে তারই দিকে নেমে যাচ্ছে দেখলাম, মামারে, তখনকার দৃশ্য দেখে ভয়ে আর বিস্ময়ে আমরা তিন ভাই একেবারে আড়ষ্ট হয়ে পড়লাম, অজিতের দিকে চেয়ে দেখি সে ভয়ে কাঁপছে, টেনে বুকে এনে সান্ত্বনা করবো ভাবছি সেই সময় কাশীবাসী বন্ধু দুইটী কাছে এসে অনুচ্চস্বরে বল্লেন—"সর্ব্বনাশ হয়েছে ভাই, সর্ব্বনাশ হয়েছে কর্ত্তার দেহটা আর পোড়ান হলো না"। ভয়ে বুক কেঁপে উঠ্‌ল—মুখ শুকিয়ে গেল, কথা বের হচ্ছেনা, তবু সাহসে ভর করে বল্লুম—"কেন ভাই? এটা কি?"—"অঘোরপন্থী সন্ন্যাসী,—অর্দ্ধদগ্ধ শব সংগ্রহ করে এরা আহার করে থাকে; এই যে হাতে চিম্‌টে দেখ্‌ছ ওই দিয়ে শবটা গেথে নেবে এখন, আর ফুসরৎ মত সাবাড় করবে?" উলঙ্গ অঘোরপন্থী ক্রমেই শবের সন্নিহিত হচ্ছিল দেখে আমরা তিন ভাই একেবারে অস্থির হয়ে পড়্‌লাম, ভয় আর বিস্ময় মুহূর্ত্তে চলে গেল, আমি দাঁড়িয়ে বল্‌লাম "বল ভাই কি করে বাবার শবদেহ রক্ষা করা যায়? বল,"—

নৈরাশ্যমূলক স্বরে বন্ধুদ্বয় বল্‌লেন "একেবারে অসম্ভব কেউ কখনো শোনেনি অঘোরপন্থীর হাত থেকে শব রক্ষা পেয়েছে, বরাবর অঘোর-পন্থী আসে না, যে দিন আসে, সে দিন আর রক্ষা নেই। বাধা দিতে গেলে হাতের চিমটেয় প্রাণ শেষ করে দেবে এখন'?" জানিনে—কোত্থেকে গায়ে অসুরের মত বল এল, কোন মন্ত্রে সকল ভীতি সকল অবসাদ এক মুহূর্ত্তে দূর হয়ে গেল, প্রাণের মমতা, স্ত্রীপুত্রের কাতর মুখ,—এক সেকেণ্ডের জন্যে ও মনে এল না, কাছে একটা প্রকাণ্ড বাঁশ ছিল, তাই নিয়ে এক লাফে বাবার অর্দ্ধদগ্ধ শব আগলে দাঁড়ালাম, ভয়ে বিস্ময়ে ভাই দুইটী একেবারে মৃতপ্রায় হয়ে পড়্‌ল, অনন্ত চীৎকার করে উঠ্‌ল,—বন্ধুদ্বয় শত হস্ত পিছাইয়া গেলেন, বাবাজী বল্লে বিশ্বাস যাবে না, আমার তখন কিছুমাত্র জ্ঞান ছিল না, শুধু এই সংকল্প প্রাণ যায় 'সোভি' আচ্ছা, শব নিতে দিব না!—সন্ন্যাসীটা একটু থম্‌কে দাঁড়াল,—আবার কি জানি কি ভেবে অবোধ্য স্বরে তিনটা চীৎকারধ্বনি করে উঠ্‌ল, পিশাচের মত খল্ খল করে হেসে, হাতের চিমটা আমার দিকে উঁচু করে বেগে নেমে আসতে লাগ্‌ল,—ভগবান্ জানেন্ তখন কি করে-ছিলাম—আধ ঘণ্টা বাদে চোখ চেয়ে দেখলাম অনন্ত আমার মাথাটী কোলে করে বসে আছে, ভাই দুটী গামছা দিয়ে বাতাস কর্‌ছে। ঘামে আমার সকল দেহ সিক্ত মাথা তখনো ঘুর্‌ছে! শ্মশানের দিকে চেয়ে দেখ্‌লাম শব তেমনি জ্বল্‌ছে—হাঁপ ছেড়ে বুকটা হাল্‌কা করে নিলাম; অঘোরপন্থীর সন্ধানে চোখ তুলে চারদিক্ দেখলাম সব শূন্য, সন্ন্যাসীটা নেই! বিস্ময়ে অনন্তের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম তার

চোখ দিয়ে জল পড়্ছে—সে গদগদ কণ্ঠে বল্লে—"দাদাবাবু আপনি সন্ন্যাসীর মাথার ওপরে যে বাঁশ তুলেছিলেন, যদি সন্ন্যাসীটা ভয়ে না সরে যেত তবে সত্যি সেটা মারা যেত। আপনার সাহসে এযাত্রা রক্ষা হল।"

মামাবাবুর বীরত্বের কাহিনী শুনিয়া আমি বিস্মিত হইয়া গেলাম, গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিতে লাগিল। মামাবাবুর কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলাম, মামাবাবু শিক্ষিত সাধুচরিত্র ব্যক্তি, তিনি কাশীতে সরকারী চাকুরী করেন, দুই দিন হইল আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছেন। মামাবাবু আবার বলিলেন "ওটা মড়াথেক হতে পারে কিন্তু বেটা ভণ্ড উন্মাদ!"" —যুগলদাস আবার লজ্জানত হইল। সহসা অন্দর মহলে প্রবেশের 'ছাড়পত্র' লইয়া শ্রীমতী বিনিসুন্দরী একটু দূরে থাকিয়া আমাকে ডাকিল, অন্যান্য দিন হাতে ধরিয়া নিয়া যাইত আজ কেন যে দূরে থাকিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করিল বুঝিতে পারিলাম না। ভগ্নমনাঃ যুগলদাসকে বিদায় দিয়া যাই অন্দরে প্রবেশ করিলাম, অমনি দেখিলাম আমার পিসিমাতা ও জেঠীমাতাঠাকুরাণীদ্বয় দুই গোট গঙ্গাজলভরা কলসী লইয়া দাঁড়াইয়া আমারই অপেক্ষা করিতেছেন, তাড়াতাড়ি বিনিও একটা জলভরা শঙ্খ ঠাকুরের কোটা হইতে লইয়া আসিয়া হাজির করিল, আমি বুঝিতে পারিলাম না, এ কিসের আয়োজন! জেঠী মা ও পিসীমার মুখ ভীতিম্লান, ক্রোধে হাত পা কাঁপিতেছিল দেখিয়া আমার মুখ শুকাইয়া গেল, চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া শোবার ঘরের কবাটের আড়ালে দেখিতে পাইলাম দুটী দুষ্ট হাসিভরা চোখ আমার দিকে তাকাইয়া

আছে। মনে মনে বলিলাম আমার লাঞ্ছনা দেখিয়া হাসিতেছে, আচ্ছা, ছুটির দিন কাছে আসিয়াছে! পিসিমা ও জেঠীমার হাতের ঘড়া দুটীতে সোনারূপা ছোয়াইয়া আমার মাথায় দুঘড়া জলই ঢালিয়া দেওয়া হইল, বিনিও মাতব্বরী চালে শঙ্খের জল আমার সর্ব্বাঙ্গে ছিটাইয়া দিয়া বলিল, "মনে করেছ মেজদা, আমরা কিছুই শুনিনি, সেটী নয়?"

"হারে সুশে, তুই বাড়ী এসে এমন দস্যি হয়েছিস যে কোথাকার মড়াখেক ভণ্ডযোগীর কাছে গিয়েছিলি, হতভাগা না জানি আমার কি সর্ব্বনাশ করে এসেছিন্, ঘরে সোমত্ত বউ!" পিসিমা রাগে ও অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিলেন, জেঠীমার মুখেও ঠিক্ এমনি সব অভিযোগ শুনিতে পাইয়া নিশ্চয় মনে হইল যে কালরাত্রে নবাগত সঙ্গিনীটীর প্রতি এতটা বিশ্বাস করা বুদ্ধিমানের কাজ হয় নাই।—অগত্যা মনের আক্রোশ মনেই চাপিয়া রাখিয়া যথাসাধ্য কৈফিয়তে ইহাদের প্রবোধ দেওয়ার বৃথা চেষ্টার অভিনয় করিতেছিলাম,—'ঝাড়াফুকা' যাহা যাহা মেয়েলী শাস্ত্রে লিখিত আছে এই মাতৃহীন, জেঠীমা ও পিসীমার একমাত্র আদরের দুলাল সন্তানটীর প্রতি তাহার কোন ব্যবস্থারই ত্রুটি হইল না। সারাদিন অনুযোগ অভিযোগের বিপুল বোঝা বহন করিয়া সন্ধ্যার পর শোবার ঘরে যাইয়া শুনিয়া আসিলাম, গতরাত্রে আমায় স্পর্শ করার অপরাধে বিশ্বাসহন্ত্রী গুপ্তচরীর (মেয়েস্পাই) প্রতিও কোন ব্যবস্থার কসুর হয় নাই। শুনিয়া সুখী হইলাম, বিশ্বাসহন্ত্রীর দুষ্ট হাসিভরা চোখ দুটীর নীচে যেখানে মোটা কাজলের রেখা হ্রদের তীরে শ্যাম-বনশ্রেণীর শোভা বিস্তার করিতেছিল তাহারই খানিকটা ম্লান বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া বিনির ভয়ে পালাইয়া গেলাম

(৪)

কলেজ খোলার দিন যতই কাছে আসিতে লাগিল ততই কিন্তু দুষ্ট হাসিভরা চোখদুটী ম্লান, জল-ভারাক্রান্ত হইয়া আসিতেছিল। নিজের মধ্যে নিজে সমাহিত হইয়া দেখিলাম এবং দেখিয়া বিস্মিত হইলাম—যাহাকে জব্দ করিব ভাবিয়া একদিন শাসাইয়াছিলাম আজ শুধু তাহাকেই জব্দ করিতে পারিয়াছি এমন নহে, নিজেও নিজের প্রবাসযাত্রায় অতিমাত্র জব্দ হইতে বসিয়াছি—অশ্রু শুধু 'দুটী' চোখে নয় চারিটী? না না তাই বা কেন, বাড়ীশুদ্ধ সকলের চোখই উৎলাইয়া উঠিতেছে। একটা বছর কোন মতে চোখ বুজিয়া কাটাইয়া দিতে পারিলেই হইত, সেই একটা বছর, অহো, যুগ যুগান্তরও বুঝি এতটা কঠোর দীর্ঘ নয়!

সেদিন আহারে বসিয়া কখন অজ্ঞাতে দুইবিন্দু জল চোখের কোণ দিয়া পাতে ফেলিয়াছিলাম জানি না, পিসিমার চোখে পড়িয়া গেল,—"হারে সুশে কাঁদছিস্? কেন বাবা বিদেশে কি কেউ যায় না? আর বিদেশই বা এমন কি? রেলে ক'ঘণ্টার রাস্তা? ছি বাবা!" সহসা সামলাইয়া লইয়া মুখে স্বাভাবিক হাসির পরিবর্ত্তে দন্ত বিকাশ করিয়া কহিলাম, "না পিসিমা, কাঁদিনি, তবে হ্যাঁ তোমাদের এই রান্না খেয়ে আজ কলকাতার উড়ে বামুনের বিশ্রী রান্নার কথা মনে পড়ে গেল। আহা কি রান্নার শ্রী, ব্যাটা কি যে রাঁধে পিসিমা, যদি খেতে তবে তোমার বাপের অন্নপ্রাশনের ভাতশুদ্ধ উঠে আস্ত।"

পিসিমা আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, 'আহা মাস মাস তিরিশটা টাকা করে খরচ নিয়ে আবাগের বেটারা বাছাদের এমনি খাওয়াই খেতে

দেয় গা, বাড়ী এলে আর মুখের দিকে তাকান যায় না, কথায় বলে কলকেতার ঠক্!" পিসিমার হস্ত হইতে কোন প্রকারে মুক্তিলাভ করিয়া যাই—পান খাইবার অছিলায় শোবার ঘরের দিকে পা তুলিয়াছি অমনি, ছোকরা চাকরটা আসিয়া সংবাদ জানাইল, যুগলদাস বৈরাগী বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে, এখনই সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিতেছে। পানটা মুখে গুঁজিয়া বাহিরে যাইয়া দেখিলাম, যুগলদাসের আজ গুরুতর পরিবর্ত্তনের চিহ্ন নাকে মুখে চোখে এমন কি সমস্ত শরীরে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। আমি চমকিয়া উঠিলাম, যুগলদাস কাঁদিয়া কাঁদিয়া বড় বড় চোখ দুটি ফুলাইয়াছে। সর্ব্বাঙ্গে ধূলিশয়নের স্পষ্ট পরিচয় বিদ্যমান, চুলগুলি এলোমেলো, আমাকে দেখিয়াই যুগলদাস উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল; চোখে মুখে দুই হাত চাপা দিয়া ধরিয়াও যুগলদাস অন্তরের আবেগ সামলাইয়া লইতে পারিতেছিল না, অজস্রধারায় তাহার গণ্ড ও বক্ষস্থল ভাসিয়া যাইতেছিল, সে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল, আমি তাহার হাতদুটী ধরিয়া কোটায় আনিয়া বসাইয়া অনেক রকমে মনোবেদনার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, কিন্তু সে কিছুতেই বলিতে পারিতে-ছিল না, আমি বেশ বুঝিতেছিলাম, যুগলদাস হৃদয়ের সকল বেদনা আমারই কাছে নিঃশেষে উজাড় করিয়া দিবার জন্যই এই অসময়ে আসিয়াছে। অনেকক্ষণ কাঁদিয়া বুকের ভারটা লঘু করিয়া লইয়া মুখে একটু হাসির রেখা ফুটাইবার বৃথা চেষ্টা করিতে করিতে যুগলদাস কহিল, "সুশীলবাবু, বড্ড ঠকেছি। শিক্ষা আর সঙ্গের দোষে—বুঝতে পারিনি দুনিয়ার এপিঠ ওপিঠ এ দুটোই সত্য। আর এও জেনেছি 'ব্যাভিচার'

চিরকালই ব্যাভিচার, ওকে ধর্ম্মের আবরণে ঢেকে রাখলেও সেটা কুষ্ঠরোগীর পূঁযের মত আবরণকে এক সময় না এক সময় ভিজিয়ে তুলবে সন্দেহ নেই। আপনি জ্ঞানী আপনাকে উপেক্ষা করে অপরাধ করেছি মার্জ্জনা করবেন"।

আমি ভাবিলাম বিষয়টা এমন কিছুই নহে, যুগলদাস এই মাত্র নবীন যুবা, সংসারে বিশ্বাসের বাঁধে একটা আঘাত খাইয়াছে হয়ত তাই এমন অস্থির হইয়া ভাঙ্গিয়া যাইবার মত হইয়াছে, শীঘ্রই সারিয়া উঠিবে। বলিলাম "সে কি রকম ভাই যুগল ?—ঠক্‌লে কেন ? আর এ সব কথার মানেই বা কি, কান্নাই বা কিসের ভাই" ? যুগলদাস ক্রমে সুস্থ হইতেছিল, বলিল "সুশীলবাবু, অপাত্রে বিশ্বাস করে ঠকেছি, হৃদয়ের সরল বিশ্বাস ভালবাসা, যে আচার পদ্ধতির উপর ঢেলে দিয়ে একনিষ্ঠ ভাবে চলে এসেছি এতটা দূরে, আজ হঠাৎ ভুল ভেঙ্গে-গিয়ে বুঝতে পারলাম সেটা কিছুই নয়, একটা মূর্ত্তিমান্‌ ব্যভিচারকে, চোখে ধূলি দিয়ে সাধনা বলে খাড়া করা হয়েছে, আর আমারই মত অল্পজ্ঞ সরল বিশ্বাসীর মাথা খেয়ে খেয়ে এই বিরাট ব্যাভিচার গগনস্পর্শী হয়ে উঠ্‌ছে।" আমি অনেকটা বুঝিতে পারিলাম বটে, তবু জিজ্ঞাসা করিলাম "খুলেই বলনা ভাই ?" যুগলদাস উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "ভণ্ড, ভণ্ড, সব মিথ্যা, এদের আচার অনুষ্ঠান, সাধনা বন্দনা, সব মিথ্যা, সুশীলবাবু—বাঙ্গালায় এত বড় একটা সম্প্রদায় তারা এমনি অন্ধ, এমনি কামুক, এমনি ভণ্ড, গুরুবেশী পিশাচদিগের হাতে খালি আত্মসমর্পণ নয়, নিজেদের মাতা পত্নী ভগিনীকে পর্য্যন্ত সমর্পণ করে নিঃশঙ্ক চিত্তে ঘুমুচ্ছে দেখে আমার বুক ফেটে কান্না আসছে।

দুদিন আমি কিছু মুখে দেইনি, রাত্রে ঘুমুইনি, খালি কেঁদেছি—সুশীলবাবু আর হাত চাপ্‌ড়ে বুক ভেঙ্গে ফেলতে চেষ্টা করছি—বিশ্বাস যদি বুকের কোনটা অংশে অজ্ঞাতে কিছুটা থেকে যায় ?"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, " ব্যাপারটা কি রকম" ?

যুগলদাস বলিতে লাগিল, "সুশীল বাবু গোসাঞজীকে আর মড়াখেক সাধুটাকে আমি বিশ্বাস করতাম, কিন্তু আপনি বিশ্বাস করতেন না তা ভালই করতেন, আপনার বুদ্ধির উপরে আমার অনেকটা শ্রদ্ধা আছে বলে আমি পরীক্ষা করে দেখতে লাগলাম, সাধুটা দিন রাত কি করে, রোজই দেখতাম মড়াখেক সাধুটা সন্ধ্যা আরতির পরে গোসাঞজীর আঙ্গিনা যখন খালি হয়ে যায় তখন আঙ্গিনার একধারে গিয়ে গোসাঞজীর ঘরের দিকে মুখ করে বসে থাকে। এমনি করে রাত কেটে যায় তার রোজ। আমি একটা আম গাছের ছায়ায় আড়াল থেকে এই দুর্ভেদ্যরহস্য ভেদ করতে চেষ্টা করতাম্। কোন দিন দেখতাম ভক্তগণ রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তিমান অবতার নবশক্তি ও গোসাঞজীকে এক শয্যায় ঘুম পাড়িয়ে চলেগেলে সাধুটা সেই ঘরের চারদিকে, রুদ্ধদ্বার ভাণ্ডার ঘরের চার দিকে লুব্ধ দৃষ্টি ক্ষুধার্ত্ত কুকুরের মত ঘুরে ফিরত। কখনো বা দোরের গোড়ায় পড়ে থাক্‌ত। একদিন গোসাঞজী দোর খুলে উঠেই সাধুটাকে দেখ্‌তে পেয়ে চম্‌কে উঠলেন, আমি বেশ দেখ্‌তে পেলাম সে দিন দিব্য জ্যোৎস্না ছিল, গোসাঞজীর মুখ শুকিয়ে গেছে, গোসাঞজী চাপাস্বরে বল্লেন "হতভাগা তেরোটা টাকা দিলাম হাতে ধরে, তবু মাগীর মায়া ছাড়তে পারিসনি এখানে আবার এতদিন

পরে মরতে এলি ?” সাধুটা বল্লে—“দোহাই ঠাকুর, আমায় এক দিনের জন্য ফিরিয়ে দাও, আমি এর জন্য পাগল হ'য়ে গেছি, তোমার তেরো টাকার জায়গায় তিরিশ টাকা ফিরিয়ে দিচ্ছি, আমার ঘরের স্তিরি, তুমি আমায় ফিরিয়ে দাও।” গোসাঞজী বল্লেন, “হারে বোকা এখন কি আর ফিরিয়ে দেবার যো আছে ? এখন যে তোর স্ত্রী আমার “হলাদিনী শক্তি” হয়েছেন, হাজার টাকা দিলেও আর ফিরিয়ে দেবার যো নেই, যদি বাড়াবাড়ি করিস্ তো এ তল্লাটে আর মাথা গুজতে জায়গা পাবিনে বলে রাখছি”। সাধুটা বল্লে, “গোসাঞজী, আমি না বুঝে অন্যায় করে ফেলেছি, আমি ভাবিনি যে একে ছাড়া আমার একদিনও চলবে না, তাই”—

“তাই গুরুর সেবাদাসীটি বিক্রী করে তেরো টাকা নিয়ে এতদিন পরে আবার গুরুপত্নী হরণ কর্ত্তে এসেছ বদমাস্ ?” “ঠাকুর, যেদিন তুমি এ অধম শিষ্যের সর্ব্বনাশ করেছিলে, স্মরণ হয় কি ? সেদিন তোমায় খুন না করে স্তিরিটী সঙ্গে দিয়ে প্রণাম করে বিদায় দিয়েছিলুম, তুমি তেরোটা টাকা ফেলে রেখে এসেছিলে, ভেবেছিলে ছোট লোক টাকা পেয়ে স্তিরির শোক ভুলে যাবে, কিন্তু ঠাকুর, একি ভুলবার জিনিস ! আমি সেই থেকে তোমার সন্ধানে সন্ধানে ঘুরেছি, পাগল হয়ে মড়ার মাংস খেয়েছি, কতকটা পেটের জ্বালায়ও বটে। আমি আর বেশী দিন বাঁচবোনা, একবারটী আমার হাতে দাও, আমি আবার তোমায় দিয়ে যাবো”। এই বলে সাধুটা গোসাঞজীর পায় লুটিয়ে কাঁদতে লাগল। যুগলদাস ঢোক গিলাইয়া একটু দম লইয়া আবার বলিতে লাগিল

"সুশীল বাবু বল্লে বিশ্বাস যাবেন না, এরই মধ্যে ঘর থেকে সেই * * টা এসে সাধুটার মুখে বুকে পাঁচসাতটা লাথি মেরে বিড় বিড় করে বলতে লাগ্‌ল "পোড়ার মুখো, মাগকে ভাত কাপড় দেবার জুটেনা, তবু মাগ নিতে এসেছিস্ ! দূর হয়ে যা বলছি, কাল যদি আর এ বাগানে দেখতে পাইত খুন করে ফেলবো" এই বলে গোসাঞজীর হাত ধরে ঘরে যেয়ে দোর বন্ধ করে দিল। সাধুটা বাহিরে পড়ে সারারাত ফুঁফিয়ে কাঁদতে লাগ্‌ল।" সকাল বেলা উঠে দেখ্‌লুম্ হতভাগ্য সাধু বাগানের একধারে মড়ার মত পড়ে আছে। কাছে যেতে ইচ্ছা হল না, সেই থেকে দুদিন কেবলই কান্না পাচ্ছে সুশীল বাবু, কেন এ সাধুতার পোষাক পরে আমরা আত্মহত্যা করে মরছি—এপ্রকাণ্ড আত্মঘাতী সমাজের মধ্যে আর মুখ দেখাবার সাধ নেই সুশীলবাবু—আমি বৃন্দাবনে যাচ্ছি।"

আমি বলিলাম, "ভুল করছ ভাই যুগল, যে সমাজে তোমার মত সরল বিশ্বাসী চরিত্রবান ব্যক্তি একজনও বাস করে সেই সমাজ নির্জ্জীব হলেও একেবারে মরে যায়নি একথা বলতে পারি খুব। তুমি যদি এই অন্ধ সমাজ ত্যাগ করে চলে যাও তবে অন্ধকারে পথ দেখাবার জন্যেও যে কেউ থাকবে না ভাই যুগল!"—

যুগলদাস টানিয়া নিশ্বাস বাহির করিয়া বলিল, 'সুশীলবাবু, আমি ঢের ভেবে দেখেছি এই অন্ধতার প্রবল স্রোতে দুটী চারটী তীক্ষ্ণদৃষ্টি লোক থাক্‌লেও তারা পাতালের পথ আগলে রাখতে কিছুতেই পারবে না, বরং জনতার ধাক্কায় তাদেরই গর্ত্ত সই হতে হবে সববাইর আগে! সুশীল বাবু, আমি কিছু কিছু লেখাপড়া করেছিলুম সেত জানেনই,

তাছাড়া ঘরে বসেও কিছু শিখেছিলুম, আমার জাত কুল কি তাত জানি সুশীল বাবু, তার জন্য ভাবিনে, ভাবি আমার মনুষ্যত্বের জন্য যেহেতু আমি শুধু তারই জন্য দায়ী, তাতেই জাত বৈরাগীর সন্তান হয়েও হাসিমুখে আপনাদের মত লোকের দ্বারে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে এসেছি এতদিন! আরত পারিনে সুশীল বাবু, বুক যে একেবারে ধ্বসে গেছে, বিশ্বাস যে একেবারে খসে গেছে। এমন স্নেহময় মাতাপিতার কোলেও আর যে জুড়াতে পারছিনে সুশীল বাবু, এই ব্যাভিচারের আবেষ্টনের মধ্যে চন্দ্রাকে নিয়েও তার সংসার পাতবার ভরসা রাখিনে, শুনলুম্ আপনি ৩টায় যাবেন, আমিও রাত ৯টার গাড়ীতে চম্পট দিচ্ছি।"

এই জাত বৈরাগীর ছেলে যুগলদাস ক্রমেই যে তার চরিত্রের মাধুর্য্যে আমায় আয়ত্ত করিয়া লইতেছিল, একথা চিন্তা না করিলেও আজ সহসা সহজেই বুঝিয়া লইতে পারিতেছি। যুগলদাস অতি বড় শ্রদ্ধার বুকে বজ্রাঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া সংসার ও স্বকীয় সমাজের প্রতি একান্ত বিদ্বিষ্ট আস্থাহীন হইয়া পড়িয়াছে। তাহার মুখের ভাবে ও কথার ভঙ্গীতে বেশ বুঝিতে পারিলাম যে যুগলদাস বৃন্দাবন যাত্রায় কৃতসঙ্কল্প, তাহাকে ইতঃপর ফিরাইয়া রাখা কঠিন।

আমি অন্যভাবে কথাটা ঘুরাইয়া বলিলাম, "তাহলে চন্দ্রাকে তুমি নিয়েই যাচ্ছ। আহা চন্দ্রা বেশ মেয়ে, তোমারই যোগ্য!"—যুগলদাস বাধা দিয়া বলিল "মাপ করবেন সুশীল বাবু, কাউকে সঙ্গে নিয়ে যাবার মত মানসিক অবস্থা এখনো আমার হয়নি, বৈরাগীর সমাজে অজ্ঞাত-কুল চন্দ্রার ব্যাভিচারের যোগ্য কুলাঙ্গারের অভাব হবে না। আমি

চল্লুম!"—যুগলদাস হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল। একবার ফিরিয়াও চাহিল না। দুপুর বেলা মনটা ভারি খারাপ হইয়া গেল, যুগলদাসের আশ্চর্য্য রকমের মানসিক পরিবর্ত্তনের চিন্তাটা আমাকে কেমন অন্যমনা এবং অসুস্থ করিয়া তুলিল, আমি জানিতাম যুগলদাস চন্দ্রাকে ভালবাসে, চন্দ্রাও তাহাকে ভালবাসে, এই দুটী কিশোর চিত্তের মধুর বন্ধন—এক টানে ছিন্ন করিয়া ফেলিলে তুমি কোন্ নিষ্ঠুর দেবতা? যুগলদাসত পুরুষমানুষ, মনের বিরাগে দেশ বিদেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া একদিন হয়ত কোথাও যাইয়া একটি আশ্রয় পাইয়া জুড়াইবে,—আর চন্দ্রা? আহা, সেযে জাত বৈরাগীর সন্তান মুক্ত শৃঙ্খল পাখী হইলেও এই বাঙ্গালারই বিহঙ্গী, সে যাহাকে একবার ভাল বাসিয়াছে একবার স্বামী বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, প্রাণ থাকিতে তাহাকে আর ভুলিতে পারিবে কি? ভাবিতে ভাবিতে পুঁথিপত্র গুছাইবার জন্য শোবার ঘরে ঢুকিয়া পড়িলাম্—বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, আষাঢ়ের আকাশ মেঘমুক্ত, নির্ম্মল, কিন্তু ভিতরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, দুষ্ট হাঁস ভরা চোখ দুটীর মালিক, আষাঢ়ের বর্ষণশীল মেঘমালার সকল ঐশ্বর্য্য আপনার মুখমণ্ডলে আহরণ করিয়া লইয়া গরীবের মাথায় বজ্র ক্ষেপণের অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। আমি অনন্যোপায় হইয়া "জৈমিনি জৈমিনি" বলিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম, সহসা মেঘের কোলে বজ্রশূন্য কটাক্ষের বিদ্যুৎ, আর সঙ্গে সঙ্গে ওষ্ঠপ্রান্তে ক্ষণমুক্ত রবিরশ্মি বিকাশের মত ঈষৎ হাসি খেলিয়া গেল!

বাহিরে দুপ্‌দাপ্ শব্দ শুনিয়া চাহিয়া দেখিলাম, স্নেহময়ী বিনি, আমার

সমস্ত জিনিসপত্র গুছাইয়া একেবারে সাজাইয়া রাখিয়াছে। ছোকরা চাকর আসিয়া জানাইল 'গাড়ী প্রস্তুত'!

(৫)

তিন বৎসর যুগলদাসের সঙ্গে দেখা নাই, সে যে সেই তিন বৎসর আগে সরল বিশ্বাসে আঘাত পাইয়া শেষ দেখা করিয়া দেশের, সমাজের, মাতা পিতার, এমন কি প্রণয় পাত্রী চন্দ্রারও পর্য্যন্ত সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া পাগলের মত দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, কৈ আর ত সে ফিরিয়া আসিল না, তাহার বৃদ্ধ মাতা পিতার শোকের কাহিনী অনেক বার শুনিয়াছি, চন্দ্রার নীরব রোদনের দীর্ঘশ্বাস অনেক বার যেন বাতাসেই ভাসিয়া আসিয়া আমার মর্ম্মস্পর্শ করিয়াছে, সরকারী কাজের অবসরে মাঝে মাঝে ছাঁৎ করিয়া যুগলদাসের কথা মনে পড়িয়াছে, দূরে খঞ্জনীর আওয়াজ শুনিলে তারই পেছনে যুগলদাসের মধুর কণ্ঠস্বর শুনিবার আশায় কাণ খাড়া হইয়া উঠিয়াছে, হৃদয় অজ্ঞাতে সেইদিকে ছুটিয়া গিয়াছে, কিন্তু তিন বৎসর—সুদীর্ঘ তিন বৎসর কেমন করিয়া চলিয়া গেল জানি না। ইহার মধ্যে একদিনের জন্যও যুগলদাসের সাক্ষাৎকার মিলিল না, সে যে সত্য সত্যই সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া আকাশের মত উদার প্রাণে মহাকাশের বুকে উড়িয়া বেড়াইতেছে তাহাতে ত কিছু ভুল নাই। সে যে এমনি একটা মহত্বের প্রেরণা লইয়াই সংসারে আসিয়াছিল। আজ যুগলদাসের কথাটা সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেবলই মনের মধ্যে জাগিতেছিল।

সরকারী চাকুরী লইয়া আজ দুই বৎসর পরে বাড়ী আসিয়াছি। ইতিমধ্যে আমাদের সংসারের বিশেষ কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন ঘটে

নাই, তবে একটী নূতন শিশু অতিথি, সেই দুষ্ট হাসিভরা চোখ দুটীর মালিকের কোলটা দখল করিয়া লইয়া এই দুই বৎসর তাহাকে বড়ই বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। শিশুটী বড় চঞ্চল, বড় দুষ্টু, চোখদুটী তার মায়েরই মত দুষ্ট হাসি ভরা! পিসিমা আর জেঠীমা অতিথিটীকে আদর দিয়া দিয়া একেবারে মাথায় করিয়া রাখিয়াছেন। অতিথিটীর অত্যাচারের অভিযোগ সংসারে কেবল একটী ব্যক্তির কাছেই দিন রাত শুনিয়া শুনিয়া এতদিন একটী ধাত্রী পরিচারিকার সন্ধান লইতে ছিলাম। কিন্তু ভাল স্বভাবের এই শ্রেণীর মেয়েমানুষ অনেক সময় মিলে না। একদিন সন্ধ্যার পরে শিশুর জননী আমাকে একটী নূতন ধাত্রীর সংবাদ দিলেন, মেয়েটী অন্য কেহ নহে আমাদের যুগলদাসের মনোনীত পাত্রী চন্দ্রা। চন্দ্রা জানিত আমার সঙ্গে যুগলদাসের ভাব ছিল, আমি হয়ত যুগলদাসের কোন না কোন খবর জানি, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে হয়ত তাহার হারানিধির সন্ধান মিলিলেও মিলিতে পারে, তাই নাকি চন্দ্রা কিছুকাল ধরিয়া সতর্কতার সহিত আমাদের বাড়ীতে যাতায়াত করিতেছিল, আজও নাকি বিকাল বেলা গৃহিণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল, সে নাকি তাহার সঙ্গে অনেক সুখদুঃখের কথা বলিয়া গিয়াছে, এবং নবাগত শিশুটীর প্রতি অত্যন্ত আকর্ষণ দেখাইয়া ইহারই সেবা করিবার অনুমতি ভিক্ষা চাহিয়াছে। গৃহিণী নাকি তাহাকে আশ্বাসও দিয়াছেন, আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া আশ্বাস দেওয়ায় আমার হাকিমী মেজাজ একটু উষ্ণ হইয়াছিল, আমি বলিয়াছিলাম, "ওগো ঐশ্বর্য্যমদমত্তিকে, বাড়ীর কাউকে জিজ্ঞাসা না করেই ঝি চাকর রাখার বাতিকটা এত বেড়ে উঠল কেন? এটাত বিদেশ নয়, পিসিমা,

জেঠীমা, এঁরা ও ত এখনও বেঁচে আছেন, আমি না হয় ভেঁড়াই হয়েছি!” কথাটী বলিয়া ভাবিয়াছিলাম, খুব শক্তই বলিয়াছি, ইতঃপর কাঁদিয়া শয্যা ভাসাইবে, চোখ ফুলিয়া রাঙ্গা জবা হইবে,—অন্ততঃ তিন চারি দিন নিঃশব্দে বর্ষণ হইবে।—ও হরি, সেই দুষ্ট হাসিভরা চোখদুটী তেমনি ঘুরাইয়া হাসির তীক্ষ্ণতীর ছুড়িয়া ছুড়িয়া বলিয়া উঠিল কিনা, “মাইরি হুজুর; কসুর মাফ্ কিজীয়ে!”—আবার হাসি, আবার বিদ্যুৎ—আমার আপাদ মস্তক রাগে জ্বলিয়া যাইতেছিল—আমি কহিলাম, “যুগলদাসকে আমি ছোট ভায়ের মত দেখ্‌তুম্, চন্দ্রাকে আমি কখনো চাকরাণী রাখতে পারিনে, এটী বোঝবার শক্তি যাদের নেই, তারা আবার সবার মাথার ওপর দিয়ে জ্যাঠাম করে কেন”?—আবার সেই হাসি, সেই বিদ্যুৎ—সঙ্গে সঙ্গে ছেলের মুখে অজস্র চুম্বন! নাঃ—একেবারে হারাইয়া দিবারই যোগাড় করিয়া ফেলিল দেখিতেছি, একটু নরম হইব কি না, ভাবিতেছি—সহসা ঘরে একটা ছায়া পড়িল, দরজার দিকে চাহিয়া দেখিলাম, ছিন্ন মলিন বেশে—দাঁড়াইয়া ‘চন্দ্রা’।—‘চন্দ্রা’? “আজ্ঞে হ্যাঁ”—বলিয়া মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। আমি কহিলাম “চন্দ্রা, আমি যুগলদাসের কোন সংবাদ পাইনি, তুমি কি এখনও তাকে ভাবো”? চন্দ্রা নীরবে শুধু অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিল, ইতিমধ্যে নিদ্রোত্থিত শিশুটী চন্দ্রার দিকে তাকাইয়া হাত বাড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল, চন্দ্রা টানিয়া বুকে লইয়া খাড়া হইয়া দাড়াইয়া কহিল, “আমি ওকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারবো না, আমি চাকরাণী নই বাবু,—আমি খোকার মাসী”। “চন্দ্রা, আমি কত জায়গায় ঘুরি, তুমি গৌরদাসের একমত ঘরের বউ বল্লেই হয়, আমার সঙ্গে

তোমার যাওয়াত ঠিক হবে না"। চন্দ্রা আবার কহিল "আপনিত জানেন, আপনার দাস কোন দুঃখে দেশত্যাগী. আমাকে কি দেশে থেকে তাঁর সেই দুঃখের ওজন বাড়িয়ে দিতে বল্‌ছেন? আমি এদেশে এস্থানে কিছুতেই থাকবো না, থাকলে আমার জাতকুল কিছু থাকবে না"। দুষ্ট-হাসিভরা চোখদুটীর মালিক তেমনি অচল অটল, বেশীর ভাগ ঠোটের উপরে দন্ত-সংলগ্ন করিয়া আমাকে জব্দ করিয়াছে বলিয়া যেন গর্ব্ব প্রকাশ করিতে লাগিল। চন্দ্রা ছেলে কোলে লইয়া এমনি ভাবে দাঁড়াইল, যে ইহার পর তাহাকে জবাব দেওয়া শক্ত হইয়া উঠিল। আমি বলিলাম, "গৌরদাস বাবাজী কি মত দেবে"? চন্দ্রা উদ্দেশে প্রণাম জানাইয়া কহিল, "তাঁর অমত নেই"। আমি একটু ইতস্ততঃ করিয়া কি বলিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি দেখিয়া চন্দ্রা কহিল, "আমি খোকার মাসী হলেও জাতে বৈষ্ণব, রান্না ঘরে আমি কখনো যাবো না"—অমি বলিলাম, "সেত না হয় যাবে না, কিন্তু তোমায় কোথা রাখবো"! চন্দ্রা একটু হাসিয়া কহিল "সেচিন্তা দিদিই করবেন এখন, আমার জন্য আপনার ভয় নেই"। আমি বুঝিলাম এ সকল বন্দোবস্ত আগে হইতেই ঠিক্ হইয়া আছে, সুতরাং বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া পিসীমাদের কাছে একবার শেষ জিজ্ঞাসা করিয়া নিবার জন্য চলিয়া গেলাম! সেখানে যাইয়া আরও জানিতে পারিলাম যে চন্দ্রা পিসীমাদেরও দয়া আকর্ষণ করিয়া লইতে কিছুমাত্র ক্রুটী করে নাই এবং জেঠীমা ও পিসিমার দয়া সে সম্পূর্ণ রূপেই আদায় করিয়া লইয়াছে। পিসিমা আরও বলিলেন যে চন্দ্রা নাকি তাহার কাছে জানাইয়াছে গৌরদাস এখন প্রাচীন, বিশেষতঃ পুত্রশোকে শয্যাশায়ী—কুচরিত্রের লোকে চন্দ্রাকে

সর্ব্বদাই বিরক্ত করিতেছে ইত্যাদি। ইহার পর অমত করিবার সাহস হইল না, সুতরাং চন্দ্রা রহিয়া গেল। খোকার জননী এইবার একদিন চোখ ঘুরাইয়া বলিলেন, "বড়দিনের বন্ধে খোকার মাসীকে নিয়ে বৃন্দাবন যেতে হবে,"—দূরে চন্দ্রা দাঁড়াইয়াছিল, তাহার কোলে খোকা, টস্ টস্ করিয়া কএক ফোটা চোখের জল—খোকার বুকে ঝরিয়া পড়িল, খোকা চন্দ্রার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিল, "মাছি কানে"—আবার জননীর দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল "মা, মাছি কানে"! খোকার মাতা প্রভুর মত লিয়া গেলেন "তা কেঁদনা বোন্ বড়দিনের বন্ধেই বৃন্দাবন যাওয়া স্থির"! সেই হাসি, সেই বিদ্যুৎ।

(৭)

উপরওয়ালার অনেক রকম খোসামুদীর ফলে বড়দিনের বন্ধের সঙ্গে একমাস অতিরিক্ত বিদায় মঞ্জুর করাইয়া বাড়ী হইতে জেঠীমা ও পিসিমাকে আনাইয়া লইয়া—পৌষের প্রবল শীত অগ্রাহ্য করিয়াই খোকার মা এবং মাসীর পীড়াপীড়িতে এইবার বৃন্দাবন যাত্রা করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। আজ সাতদিন শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবনধামে আমরা উপস্থিত হইয়া এখানকার দর্শনীয়স্থান ও দেবতা দর্শন করিয়া ধন্য হইতেছিলাম, দারুণশীতে নীল-যমুনার-স্বচ্ছ-শীতল-সলিলে প্রতিদিন সকালে অবগাহন করিতে বাধ্য হইয়াও কেমন যেন আন্তরিক শান্তি অনুভব করিতে লাগিলাম, প্রত্যহ প্রাতঃকালে স্নান করিয়া দেবতা দর্শনে বাহির হইতাম এবং বেলা ১২টায় বাসায় ফিরিয়া আহারাদি করিতাম। আহারান্তে জেঠীমা ও পিসিমা

ভাগবত পাঠ করিতেন, খোকাবাবুর মা ও মাসী একটী ভৃত্য মাত্র সঙ্গে করিয়া রোজই বাহির হইয়া যাইতেন এবং প্রায় সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিতেন। খোকাবাবু যেদিন সজাগ থাকিত সেইদিন মাসীর সঙ্গেই রোওয়ানা করিত, ফিরাইয়া রাখিবার সাধ্য কাহারও থাকিত না। ইদানীং খোকার উপরে মার চাইতে মাসীর আদরটা বেশী দেখা গেলেও আমার পরিবারের মনে তাহাতে কিছুমাত্রও শঙ্কার উদয় হইত না, বরং খোকা মালিকটী ইহাতে বিশেষ আরাম বোধই করিতেন। চন্দ্রা যথার্থই সুশীলা, এবং সচ্চরিত্রা, তাহার উপরে আমাদের সকলের অগাধ বিশ্বাস এবং স্নেহ জন্মিয়াছে। খোকাবাবুটীত 'মাছি' বলিতেই একেবারে অজ্ঞান। আমি শীতের মধ্যাহ্নে ও কাজ-কর্ম্মের অভাবে একটু চোখ বুজিয়া লইতাম। আমি জানিতাম, চন্দ্রা কিসের অনুসন্ধানে কোন্ তীর্থ দেবতার দর্শনের আশায় সুদূর বৃন্দাবনে আসিয়াছে এবং প্রত্যহ কেন তাহার দিদিটীকে লইয়া সারা বৃন্দাবন পাতি পাতি করিয়া খুঁজিয়া—সন্ধ্যার নিষ্ফলতার কষাঘাতে জর্জ্জরিতচিত্তে ম্লানমুখে বাসায় ফিরিয়া আসে। কিন্তু আমি কিছু বলিতাম না; তবে দুটী পাণ্ডাকে পুরস্কারের আশা দিয়া যুগলদাসের আকৃতি প্রকৃতির বিবরণ বলিয়া দিয়া সন্ধান লইতে নিযুক্ত করিয়াছি। দুঃখের বিষয় তাহারা রোজই আসিয়া এক একটী ভুল সংবাদ শুনাইয়া যায় এবং আমাকেও বৈকালিক ভ্রমণের ছলে তাহাদের সঙ্গে লইয়া নির্দ্দিষ্টস্থানে যাইয়া হতাশ হইয়াই ফিরিয়া আসিতে হয়। যত দিন যাইতেছিল চন্দ্রার মুখশ্রী ততই মলিন হইতেছিল, চন্দ্রা এমন যে খোকাঅন্তপ্রাণ তবু যেন আজকাল তাহার কেমন একটা স্বভাব হইয়াছে, সে সর্ব্বদাই মাটীতে

পড়িয়া থাকিতে চায়, লুকাইয়া কাঁদিয়া—চোখ ফুলায়,—শুনিলাম আহারেও নাকি তাহার অরুচি ধরিয়াছে—খোকা কাছে বসিয়া কাঁদিলেও সর্ব্বদা যেন শুনিতে পায় না, ভাবিলাম, চরম নৈরাশ্যের ফলে চন্দ্রা বা আমাদের ফাঁকি দেয়। একদিন চন্দ্রার দিদিটী মুখ ভার করিয়া জানাইলেন যে চন্দ্রা বোধ হয় আর দেশে ফিরিবে না, যে পবিত্র তীর্থের উদ্দেশে তাহার স্বামী শেষ যাত্রা করিয়া আসিয়াছিল, সে প্রাণ থাকিতে সেই তীর্থ ত্যাগ করিবে না, সেই তীর্থের রেণু সারাদেহে প্রাণে আকড়াইয়া থাকিবে; জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সে তাহার স্বামী দেবতার নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে এইখানেই পড়িয়া থাকিবে। তাই খোকার বন্ধনও সে ছিন্ন করিতে চায়, ওগো, খোকার তাহা হইলে কি দশাটী হইবে? বলিতে বলিতে খোকার জননীর চোখে জল গড়াইয়া ছুটিল, দুষ্ট হাসিভরা চোখদুটী আসন্ন সখীর বিরহ শঙ্কায় এবং নেউটে খোকার কাহিল কাতর পড়ায় আশঙ্কায়—ম্লান স্থির হইয়া পড়িল। কি যে করিব ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। ইচ্ছা ছিল, মথুরা ও গোকুল হইয়া বেনারস যাইব, কিন্তু ছুটীর বাকী দিন গুলি যে বৃন্দাবনেই কাটাইয়া যাইতে হইবে—ক্রমে সেই সিদ্ধান্তই স্থির হইয়া গেল সাধ্যানুসারে চন্দ্রার সাহায্য করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া উঠিল, এখন অন্যত্র যাইতে হইলে আমাদের তীর্থ দর্শন করা হইবে বটে, কিন্তু অসহায় চন্দ্রাকে ত্যাগ করিয়া গেলেও বোধ হয় তীর্থ-দর্শনের পুণ্য ম্লান না হইয়া যাইবে না। ছুটী পর্য্যন্ত থাকি, তাহার পর ভগবান যাহা করেন।

শীতের প্রভাতে সূর্য্যের মুখ দেখিতে দেখিতে বেলা অনেকটা হইয়া

গিয়াছে। পিসিমাদের সঙ্গে লইয়া "কেশীঘাটে" যাইবার জন্য উদ্যোগ করিলাম এই ঘাটেই স্নান করা বাকী ছিল। যমুনার নীলজলরাশি পুরাতন ঘাটগুলি হইতে বর্ত্তমানে অনেকটা দূরে সরিয়া পড়িয়াছে, তবু স্নানের জন্য সাধারণতঃ সেই ঘাট গুলিই প্রসিদ্ধ। পৌষমাসে তীর্থযাত্রীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প হইয়া থাকে, আমাদের মত যাঁহারা দেশভ্রমণ উদ্দেশে তীর্থযাত্রা করিয়া থাকেন এবং 'বন্ধ' ছাড়া যাঁহাদের নড়িবার সাধ্য একটুকুও নাই, সেই সকল জীবই এসকল সময় তীর্থে বাহির হন, কেউবা পেটের অসুখ লইয়া, কেউবা ম্যালেরিয়া লইয়া, আর কেউবা বাতিকগ্রস্ত পরিবার লইয়া—এই শুভ যাত্রা সুরু করিয়া থাকেন—ফিরিবার সময় সকলেই যে সশরীরে সপরিবারে ফিরিতে পারেন এমন কথা কেহ জোর করিয়া বলিতে পারিবে না। কিন্তু তবু বাহির হওয়া চাই, এটা যে বাঙ্গালার রেওয়াজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জেঠীমা ও পিসিমা বাবার সঙ্গে একবার আসিয়াছিলেন, আমরা নূতন যাত্রী তবু ছুটির খাতিরে এই দারুণ শীতে পৌষের মত নিষ্ফলা মাসে সুদূর পুণ্যতীর্থ বৃন্দাবনে যাত্রা করিতে বাধ্য হইয়াছি।

কেশীঘাটের ধাপে পা ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছি সহসা দূরে কিসের একটা ধ্বনি—সঙ্গীতের? হাঁ খঞ্জনী সহযোগে মধুর বাঙ্গালী কবির—কোমল পদাবলী যেন বাঙ্গালীরই সাধা গলায় শ্রুত হইল, পাছের দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম, চন্দ্রা দুই কাণ খাড়া করিয়া যেদিক্ হইতে সঙ্গীতের অস্পষ্ট-ধ্বনি বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল, সেইদিকেই তাকাইয়া বজ্রাহতের মত দাঁড়াইয়া আছে। খোকা আগ্রহ সহকারে বলিল, "মাছি,—গান"

খোকার জননী চন্দ্রার কানে কানে কি বলিলেন বুঝিলাম না, চন্দ্রা আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, অবসন্নদেহে বসিয়া পড়িল। পিসিমা খোকাকে কোলে টানিয়া লইলেন, খোকা কিন্তু আবার বলিয়া উঠিল "দাদু—গান"! "হ্যা দাদা গান"। খোকা বলিল "দাবো" "দাবো"!—এদিকে চন্দ্রা আস্তে আস্তে ঘাটের উপরে শুইয়া পড়িল— খোকার জননী এবং জেঠীমা তাহার মাথায় কদম পাতায় হাওয়া করিতে লাগিলেন,—দেখিলাম চন্দ্রা সংজ্ঞাশূন্য।—ছোকরা চাকরটাকে জল অনিতে আদেশ করিলাম, সে ঘটী লইয়া যমুনার দিকে ছুটিল। গান তেমনি বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল, যেন পরিচিতকণ্ঠ, পরিচিত পদ, সেই—গান,—যাহা একদিন যুগলদাসের কণ্ঠে শুনিয়া অশ্রুত্যাগ করিয়াছিলাম, বাঙ্গালীর ভক্ত গায়ক কবি নীলকণ্ঠের রচনা—

"হরি তোমার—মাতৃরূপ সর্ব্বরূপসার"!

গায়ক অনন্যচিত্তে উলটাইয়া পালটাইয়া একটা গানই প্রায় ৫.৬ বার গাহিয়া যাইতেছিল, গানের বিরাম নাই, কণ্ঠের অবসাদ নাই, সুর উঁচু হইতে উঁচু গ্রামে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, জেঠীমার হাতে জলের ঘটী রাখিয়া চন্দ্রার শুশ্রূষার যথাবিধি উপদেশ দিয়া সঙ্গীত অভিমুখে দ্রুত চলিয়া গেলাম, খোকা কাঁদিয়া উঠিল—"বাবা গান দাবো"—তখন অন্যদিকে মনোনিবেশ করিবার অবসর ছিল না; ছুটিয়া একটা কুটীরের দ্বারে যাইয়া হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইলাম, দাঁড়াইয়া—দাঁড়াইয়া দেখিলাম—দেখিতে দেখিতে মুগ্ধ বিস্মিত চিত্তে একেবারে বিহ্বল হইয়া অস্ফুটস্বরে ডাকিলাম "যুগলদাস" সহসা যুগলদাসের

ধ্যান ভঙ্গ হইল সে চট্ করিয়া একবার বাহিরের দিকে চাহিয়াই—একলাফে আমার বুকের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িল, এবং তুইচোখের জলে আমার বুক ভাসাইয়া দিয়া—একটু পরে জিজ্ঞাসুনেত্রে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। আমি সংক্ষেপে আমাদের আগমনবার্ত্তা—তাহাকে জানাইয়া চন্দ্রার বর্ত্তমান অবস্থার কথা বুঝাইয়া বলিলাম, যুগলদাস—সর্ব্ববন্ধনচ্ছেদন প্রয়াসী—সংসার বিরাগী যুগলদাস,—ঘরের দিকে মুখ ফিরাইয়া একটী শিশু সন্তানের স্তন্যদাত্রী জননীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"মা তোমার বৌকে আনতে চল্লুম—আশীর্ব্বাদ করো মা যদি বেঁচে আছে দেখতে পাই"! যিনি স্তন্য দিতেছিলেন, যুগলদাসের কথা শুনিয়া আগন্তুক ভদ্রলোকের প্রতি লক্ষ্য করিয়া লজ্জা ও সংকোচে লাল হইয়া মাটীর দিকে মুখ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—"এসবাবা"—আমি প্রথম আসিয়াই এই শিশুর জননীকে ঘরের একধারে একান্তমনে বসিয়া শিশুটীকে স্তন্যদিতে দেখিয়াছিলাম, আর দেখিয়াছিলাম যুগলদাস দূরে খঞ্জনী লইয়া স্তন্যদাত্রী জননীর দিকে একদৃষ্টে—চাহিয়া চাহিয়া চোখের জলে ভাসিতেছিল আর গাহিতেছিল—

"হরি তোমার মাতৃরূপ সর্ব্বরূপসার"।

যুগলদাস এই শিশুর জননীকে তখন তদবস্থায় যে ভগবানেরই রূপ বলিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে মাগিয়া লইতেছিল, তাহাতে আমার কিছুমাত্রও সন্দেহ হয় নাই যুগলদাস যেরূপ মহৎ হৃদয় লইয়া দেশত্যাগ করিয়াছিল, আজ এতদিনের পরে যাহা দেখিলাম—তাহাতে যুগলদাসকে তদপেক্ষায় এতটুকুও হীন বলিয়া মনে হইল না, কিন্তু, প্রথম এই শিশুও তাহার জননীকে

দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম, যুগলদাস সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া সুদূর বৃন্দাবনে আসিয়াও যে সেই সংসার বন্ধনেই বদ্ধ হইয়াছে এও একটা আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু ইহাদের কথার ভাবে যাহা বুঝিলাম, তাহাতে যুগলদাসের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ স্বতন্ত্র বলিয়াই মনে হইল! পথিমধ্যে যুগলদাস সংক্ষেপে তাহার এই তিন বৎসরের ইতিহাস একশ্বাসে বলিয়া ফেলিল। যুগলদাসের কাহিনীটি সংক্ষেপতঃ এইরূপ—যুগলদাস নবদ্বীপ হইতে একছুর বেনারসের টিকিট কাটিয়া কিছুকাল বেনারস থাকিয়া ভিক্ষান্নে উদরপূর্ত্তি করিয়া মনের খেয়ালে গান করিয়া যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকিত। বাবা বিশ্বনাথের রাজ্যে জাত বৈরাগীর সন্তান হইলেও যুগলদাসের মন বসিয়া গিয়াছিল। একদিন যুগলদাস রাত্রি দুইটার সময় গঙ্গার ধারে বেড়াইয়া বেড়াইয়া আপনার মনে গাহিতেছিল, সেদিন আকাশে মেঘ ছিল, ক্ষণমুক্ত চাঁদের কিরণে মাঝে মাঝে গঙ্গার জল হাসিয়া উঠিতেছিল, যুগলদাস আপনার মনের আবেগে গান গাহিতে গাহিতে যখন চতুঃষষ্ঠীর ঘাটের কাছে যাইয়া উপস্থিত হইল, তখন গঙ্গার কেবল কাছে একটী সদ্যোজাত শিশুর রোদন ধ্বনির মত তাহার কানে পৌঁছিল। যুগলদাস নিজের গান বন্ধ করিয়া দিয়া তখন আস্তে আস্তে সেই রোদন শব্দের উৎপত্তি স্থানের অনুসরণ করিয়া সেই ঘাটের নীচের সিঁড়িতে যাইয়া নামিয়া পড়িল, নামিয়া সে অবাক হইয়া দেখিতে পাইল একটী রমণী এক পা সিঁড়িতে এবং এক পা গঙ্গায় রাখিয়া এক একবার দুই হাত বাড়াইয়া কোলের শিশুটীকে গঙ্গাগর্ভে ভাসাইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছে, আবার কিজানি কি ভাবিয়া হাতদুটী গুটাইয়া লইয়া শিশুটীকে বুকে

চাপিয়া চুম্বন করিয়া করিয়া চোখের জলে বুক ভাসাইতেছে। যুগলদাস দেখিবামাত্র বুঝিতে পারিল রমণীটী শিশুসন্তানের মাতা, সে কোন কারণে শিশুটীকে গঙ্গা গর্ভে—নিমজ্জিত করিতে উদ্যত। কিন্তু মায়ের প্রাণ স্নেহের শৃঙ্খলে শত-গ্রন্থি-যুক্ত—এক একবার শিশুটীকে জলে ফেলিয়া দিয়া রমণী সকল বিপদের হাত হইতে যেন উদ্ধার পাইবার চেষ্টা করিতেছিল। আবার স্নেহের শিকলে টান পড়িয়া উদ্যত হস্ত সংকুচিত হইয়া আসিতেছিল। দেখিয়া যুগলদাস রমণীর সম্মুখীন হইয়া শিশুটীকে একটানে কাড়িয়া লইয়া নিজের বুকে তুলিয়া লইল, এবং রমণীর হাত ধরিয়া টানিয়া টানিয়া তাহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাকে দুই সিঁড়ি উপরে তুলিয়া ফেলিল। রমণী যুগলদাসের পা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল, এবং শিশুর সহিত নিজের দেহ গঙ্গা গর্ভে বিসর্জ্জন করিবার জন্য অকপট চেষ্টা করিতে লাগিল, তখন যুগলদাসের মনের অবস্থা ভয়ঙ্কর, দুটী প্রাণিহত্যার সম্ভাবনা দেখিয়া যুগলদাস এক একবার শিহরিয়া উঠিতেছিল। সে দৃঢ় সংকল্প হইয়া কহিল, "বাবা বিশ্বনাথ এ নিশীথ রাত্রে আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন শুধু তোমাদেরই জীবন রক্ষার জন্য, আমি কিছুতেই তোমাদের মরতে দিব না।" শুনিয়া রমণীটী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল এবং কহিল "ওগো তাহলে যে আমার আর মুখ দেখাবার যো থাকবে না।" যুগলদাস ব্যাপারখানা বুঝিয়া লইয়াছিল, তবু রমণী সংক্ষেপে যাহা বলিল তাহার মর্ম্ম এইরূপ—রমণীটি ব্রাহ্মণের মেয়ে, পতিকে মৃত্যুশয্যায় রাখিয়া টাকাকড়ি ও গহনাপত্র সঙ্গে লইয়া একজন আত্মীয়ের প্ররোচনায় রাত্রে গৃহত্যাগ করিয়া আসে, মেয়েটী জানিত না, তখন তাহার গর্ভে স্বামীর ঔরসজাত সন্তান বর্দ্ধমান।

আত্মীয়টী তাহাকে কাশীধাম লইয়া আসিয়া একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া স্বামী স্ত্রী পরিচয়ে কএক মাস বাস করেন এবং কিছু কাল পর এদিকে নানা প্রকার অসুবিধা বোধে একদিন অবিলম্বে অর্থ ও গহনাপত্র হস্তগত করিয়া চম্পট দেন। অসহায় অবস্থায় রমণীটি গতরাত্রে এই কন্যাটী প্রসব করিয়াছে। তাহার সহায়—ও সর্ব্বাপেক্ষা পরিচয়ের অভাবের লজ্জা তাহাকে একেবারে হতবুদ্ধি করিয়া তুলিয়াছিল, তাই দেশের লোকের গঞ্জনা হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য রমণীর এই অমানুষিক চেষ্টা। শুনিয়া যুগলদাস আরও শিহরিয়া উঠিল, সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"ভগবান্ এ আবার আমায় কোন্ শৃঙ্খলে বেঁধে দিতে চাচ্ছ!"

রমণীটী—আবার যুগলদাসের পা জড়াইয়া আত্মঘাতিনী হইবার জন্য কাতর প্রার্থনা জানাইতে লাগিল। যুগলদাস বাধা দিয়া কহিল, "তা হবে না—তোমাকে বাঁচতে হবে।" "আমি কোথা যাবো? আমার যে আর সমাজে মুখ দেখাবার যো নেই।" যুগলদাস একটু তীব্র ভাষায় কহিল "সেটা উত্তম ব্যবস্থা, সমাজে তোমার মত রমণীর প্রবেশ পথ বন্ধ থাকাই দরকার" "তবে কোথায় যাবো?"—"কেন এই কাশীতে থাক, মা অন্নপূর্ণার রাজ্যে কেউত উপোষ করে থাকে না, তা তোমরাও খেয়েই বাঁচবে।"

রমণী এইবার একটু জোর করিয়া কহিল, "না আমি এখানে আর থাকতে পারবো না তোমার সঙ্গেই যাবো, যদি বাঁচতে হয় তবে তোমার সেবা করেই বাকি কাল কাটিয়ে দেব।" শুনিয়া যুগলদাস কানে হাত দিয়া কহিল "না না মা সে হতে পারে না, আমার "মা" হয়ে যদি

যাবার মত সাহস তোমার থাকে, তবে চল আমার সঙ্গে, আমি তোমাদের ভিক্ষা করে খাওয়াব। আর যদি মনের বলে না কুলোয় তবে যেখানে ইচ্ছা যেতে পার”, এইবার রমণী কহিল, “হ্যাঁ বাবা আমি তোমার ‘মা’ হয়েই তোমার সঙ্গ নিলাম। যুগলদাস সেই রাত্রেই একেবারে ষ্টেষণে আসিয়া বৃন্দাবনের টিকিট কাটিয়াছে, দু বছরের একটু বেশি এই কুটীর তৈরি করিয়া বাস করিতেছে। ছোট খাট আরও দুই একটী ঘটনা বলিতে বলিতে যুগলদাস আমার অনুসরণ করিতেছিল, আমরা ক্রমে কেশী ঘাটের সন্নিহিত হইলাম। যুগলদাস আমার কাছে চন্দ্রার অনুরাগ বৃত্তান্ত এবং চরিত্র নিষ্ঠাব কথা সংক্ষেপে শুনিয়া লইয়াছিল, আমি বুঝিলাম, যুগলদাস এইবার নিজের বন্ধন আরও একটান কসিয়া বাঁধিবে! ভগবানের রাজ্যে মানুষের মানসিক ভাবের কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! ব্যভিচারভীত পলায়িত যুগলদাস, বাবা বিশ্বনাথের দয়ার রাজ্যে দাঁড়াইয়া ব্যভিচারকেই বুক পাতিয়া লইয়া পবিত্র করিয়া তুলিয়াছে। সংসার-ত্যাগী বৈরাগী আবার নূতন শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। অন্যমনস্ক-ভাবে একেবারে ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইলাম—তখন চন্দ্রার চৈতন্য হইয়াছে। সে তাহার দিদির পাশে বসিয়া খোকাকে কোলে লইয়া চোখের জলে স্নান করিতেছিল, যুগলদাস সুস্থিরচিত্তে সকলের পদধূলি লইয়া চন্দ্রার মুখের দিকে তাকাইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল “চন্দ্রা আমি তোমাদের ত্যাগকরে চলে এসে অন্যায় কাজ করেছিলাম, তোমাদের ত্যাগ করে চলে আসবার আমার কোন অধিকার ছিল না চন্দ্রা! আমি অহঙ্কাব করে পালিয়ে এসেও বিধাতার বাঁধন ছিঁড়তে

পারিনি। এতদিন পরে ভগবান দয়া করে আমায় সেই বুদ্ধিটুকু দিয়েছেন। চন্দ্রা, তুমি আমায় মাপ্ করো।” সহসা পশ্চাৎ দিক হইতে পূর্ব্বদৃষ্ট রমণী যুগলদাসের মাতা চন্দ্রার হাত ধরিয়া উঠাইয়া কহিল “চল বৌমা, আমি তোমায় বরণ করে নিতে এসেছি!” মাসীকে কে একজন হাত ধরিয়া লইয়া যাইতে চাহিতেছে দেখিয়া খোকা একেবারে কাঁদিয়া অস্থির হইয়া পড়িল, সে মাসীর আঁচল ধরিয়া জোর করিয়া কোলে বসিয়া রহিল, আর আধ আধ স্বরে বলিতে লাগিল ‘মাছি দাবে না, মাছি দাবে না”। এদিকে চন্দ্রার অবস্থা বড়ই সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়িল দেখিয়া আমি কহিলাম, “চল যুগল আমরা আজ এই পবিত্র মুহূর্ত্তে যমুনার জলে স্নান করে আসি,” রমণী হাত জোর করিয়া বলিল, “বাবা যুগল আমি যা'হ হই, ধর্ম্মতঃ তোমার মা, এই পবিত্র যমুনার জলে স্নান করে চল বৌমার সঙ্গে তোমার কণ্ঠী বদল করে দিই”। রমণীর প্রস্তাবে আমরা সকলেই আনন্দ সহকারে সম্মতি দিলাম বটে, কিন্তু খোকাবাবু এইসকল কথা বার্ত্তার সার মর্ম্ম সংগ্রহ করিতে না পারিলেও যুগল দাস এবং তাহার মাতাকে পরম শত্রুর মত মনে করিতে ছিল বলিয়াই মনে হইল।—সে ইহাদের যে কোন কথা শুনিতেছিল তাহারই জবাবে “মাছি দাবে না” বলিয়া উত্তর দিতেছিল, এবং বার বার বলাসত্ত্বেও ইহারা তাহার মাসীর কাছ ছাড়িতেছেনা দেখিয়া সে মহাবিরক্ত এবং চঞ্চল হইয়া উঠিল। এবং কি জানি কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় সে কণ্ঠের স্বর ক্রমেই চড়াইয়া “মাছি দাবে না”, বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। সে সময়ে সকলের সকলপ্রকার

সান্ত্বনা প্রদানের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া—শিশুর কাতর কণ্ঠ যমুনার তীর কাঁপাইয়া তুলিল। চন্দ্রার কণ্ঠ গদগদ, সে শিশুকে প্রবোধ দিতে যাইয়া নিজেই কথা বলিতে পারিতেছিল না, সে কাঁদিয়াই ব্যাকুল। চন্দ্রার দিদিটী? তাহার মুখের দিকে চাওয়া কঠিন। চোখের দুষ্ট হাসিটুকুর পরিবর্ত্তে সেখানে শ্রাবণের ধারা নামিয়াছে,—আজ শ্রাবণের মেঘমণ্ডল গর্জ্জনশূন্য, তড়িৎশূন্য ও বজ্রশূন্য,—শুধু জল আর জল! আমি খানিকটা হতবুদ্ধি হইয়া যমুনার নীল জলরাশির দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিলাম। পিসিমা অগ্রসর হইলেন। আমরা সঙ্গে সঙ্গে আস্তে আস্তে যমুনার গর্ব্ভে অবতরণ করিতেছিলাম আর ভাবিতে লাগিলাম 'ভগবান্ তীর্থযাত্রায় যদি কিছু ফল থাকে, তবে তাহা সম্পূর্ণই লাভ করিয়া গেলাম কিন্তু দুঃখের বিষয় চন্দ্রাকে লইয়া আর দেশে যাইতে পারিলাম না। তা হোক তবু চন্দ্রা যে তার অভীষ্ট দেবতা লাভ করতে পারিল ইহাই আমাদের পরম ভাগ্য! যুগলদাসকে চুপি চুপি বলিলাম "ভাই যুগল এবার বন্ধনের উপর বন্ধন!" "হ্যাঁ সুশীলবাবু, হাস্যকর কথাটাও সত্য হয়ে গেল—

"বৈরাগীর বন্ধন!"

গরীবের গর্ব্ব।

(১)

"কি হবে মা,"

"কি আর হবে ঝি! যতদিন পেরেছি ততদিন স্বামীর ভিটা কাম্‌ড়ে পড়ে ছিলাম, এখন দেনায় নিলাম হয়েছে আর কি কর্‌বো? যে দিকে চোখ্ যায় খোকাকে কোলে নিয়ে 'দুর্গা' বলে বেরিয়ে পড়্‌বো!—ভগবান্ মুখ দিয়েছেন আহারও দেবেন"—বলিয়া বিধবা কোলের শিশুটীকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া একবার ঊর্দ্ধদিকে তাকাইলেন! ঝি কহিল "তাকি হয় মা, এই বয়েস আর এই খোকাই যে তোমার শত্রু"!

বিধবা—শিশুর মুখের দিকে চাহিয়া তাহাকে বার দুই চুম্বন করিয়া কহিলেন.—"ও কথা বলোনা ঝি, খোকা যে আমার পথের সম্বল, আমি কাকে নিয়ে রাস্তায় বেরুবো ঝি! শতদুঃখ লাঞ্ছনার মধ্যেও কে আমায় সান্ত্বনা দিত। হয় মৃত্যু নয় খোকা, এ ছাড়া যে আমার রাস্তা নেই ঝি"

ঝি একটু অপ্রস্তুত হইয়া বার দুই কাসিয়া কথাটা সামলাইয়া লইয়া কহিল,—"ষাট্, আমার দাদার বালাই নিয়ে মরি, তবে কি জান মা, সোমত্ত বয়েস আর পরীর মত রূপ এই নিয়ে রাস্তায় বার হওয়া"—

বিধবা বাধা দিয়া কহিলেন,—"বয়সকে দোষ দিও না ঝি, বয়স না থাক্‌লে খেটে খেতে পারব্ কেন? বাছাকেই বা মানুষ কর্‌বো কি করে? তবে হ্যাঁ—রূপ একটা বিঘ্ন বটে, তা ঝি দেখ্‌ছত, আমি সেটাকে

দিনরাত্ গলাটীপে মার্তে চেষ্টা কর্ছি, বাকি প্রাণটুকুও ওর এরই মধ্যে শেষ হয়ে যাবে, তুমি ভেবোনা ঝি, আমি বামুনের মেয়ে, দুটী ভাত রেঁধেও কি বাছাকে মানুষ কর্তে পার্বো না" ?

শুনিয়া ঝির চোখে জল আসিল—সে কহিল, "মা—পুরুত ঠাকুর যা বল্লেন, তাতে ত তোমার সবই বজায় থাকে, ঘরের বউ কেন মা, রাস্তায় বেরুবে ? রাস্তায় বেরুলে কি আর মান ইজ্জত থাক্‌বে মা ?"

"ভিটেয় থেকেই বা মান ইজ্জত রৈল কই ঝি ! এক বৎসর হয়নি স্বর্গে গেছেন, এরই মধ্যে সাত্‌রাত আমার ঘরে সিঁদ্ কেটে চোর ঢুকেছে !—আমার মত গরীব যে এ তল্লাটে নেই, তাকি আর চোরদের কারু জান্‌তে বাকী আছে ঝি !—তবু এ অত্যাচার"—সহসা উঠানে পুরুত ঠাকুরের কণ্ঠ শোনা গেল, তিনি একটু তাড়াতাড়ি প্রবেশ করিয়া ছিলেন তাই দেখিতে পাইলেন বিধবার চোখের অশ্রু চোখেই লাগিয়া রহিয়াছে।

তাঁহার আত্ম সংবরণের শত সতর্ক চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়া গেল দেখিয়া পুরুত ঠাকুর অধোমুখে আসনে বসিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন—"অত্যাচারের কথা কইছিলে না মা ! তা তুমি যদি সামান্য জেদ্‌টুকু ত্যাগ করে, বাবুদের সঙ্গে আপোষ কর তবেইত সব মিটে যায়,—খোকা বেঁচে থাক্, অমন ভিটা দশটা হবে মা,—আর তারাত তোমায় এম্‌নি একটা ভিটায় ঘর-দরজা সব করেও দিচ্ছেন। ভেবে দেখ মা ভেবে দেখ !"

বিধবার স্বামীর সম্পর্কে পুরোহিত ঠাকুর খুড়া হইতেন, বিধবা তাঁহার সঙ্গে মুখামুখি কথাবার্ত্তা না কহিলেও কাহাকেও উপলক্ষ করিয়া শুনাইয়া

শুনাইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেন। আজিও ঝিকে সাম্‌নে রাখিয়া বিধবা কহিলেন—"এমন ভিটা দশটা হতে পারে পুরুত কাকা, কিন্তু স্বামী শ্বশুরেব ভিটাত আর একটা বই দু'টো হয় না, আমি হাতে ধরে তা কেমন করে দেব পুরুত কাকা?"

"তুমি হাতে ধরে না দিলেও যে তাঁরা নেবে মা?—বরং আপোষে মান্‌লে কিছু লাভ হতো, একটা বাড়ী, আর সাবেক জমাজমী, সহজেই হতো"।

"তা হলেও আমার শ্বশুরের দেবালয়, তাঁদেরই জীবন যাত্রার শত প্রিয়চিহ্নময় ভিটা, তাঁহাদেরই আকাঙ্ক্ষার সাক্ষী, গাছ পালা বাগান বাড়ী এ সকল আমি হাতে ধরে কার হাতে তুলে দিব পুরুত কাকা!—আমার এ সল্‌তেটা যদি বাঁচে সে একদিন বড় হয়ে তার পূর্ব্বপুরুষের বস্তু কি পাবে? তারা জোর করে নেবে তা আমি জানি, তবু আমার গুরুজন, শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত যা ত্যাগ করেন নি, আমি তুচ্ছ সুখ সুবিধার জন্য সেই ভিটাখানি ত্যাগ কর্‌বো?—হাতে ধরে? এ আমার প্রাণ থাক্‌তে হবে না পুরুত কাকা। নিক্ তারা ডাকাতের মত জবরদস্তি করে, আমি অন্ততঃ রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাল্কা বুকে ভগবানের নাম নিয়ে আমার অক্ষমতা পৌঁছে দিতে পার্ব্বো তাঁহাদেরই উদ্দেশে পরলোকে"—বিধবা ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া রহিলেন। বিধবার দৃঢ়তা দেখিয়া বৃদ্ধ পুরোহিত কিছু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। "বল্‌ছ ত মা, কিন্তু এই কচি খোকাকে নিয়ে কোথা যাবে বল্ দেখি? মা নেই বাপ নেই—দুটী ভাই তারাও ছোট, অথচ কিছু নেই সেখানে, দাঁড়াবে কোথা মা?"

বৃদ্ধ আশান্বিত নেত্রে বিধবার মুখের দিকে তাকাইলেন, সে মুখ অশ্রু সিক্ত, অবগুণ্ঠনে অর্দ্ধ-আবৃত।

বিধবা মুখনীচু করিয়া কহিলেন, "এখান থেকেই য'দি বার হই, তবে আর স্থানের জন্য ভাব্বার কি আছে পুরুত কাকা? না হয় কাশী গিয়ে রাঁধুনীগিরি করে দু'টী খাবো"—বৃদ্ধ একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আশ্রয় না থাক্‌লে কাশীত বড় নিরাপদ নয় মা, সেখানে অনেক ভূত আছে"!—

"ভূত নেই কোথা পুরুত কাকা,? এই একমাস মধ্যে প্রতিরাত্রে আমার বাড়ীতে ইট্‌পাট্‌কেল পড়্‌ছে, বামুনের বিধবার হবিষ্যির ঘরে —রাম, রাম, বল্‌তে বুক ফেটে যায় পুরুত কাকা, লোকেত বল্‌ছে এও ভূতের কাণ্ড! কিন্তু—এ ভূতের কাণ্ড কি পিশাচের কাণ্ড, তা আপনিও জানেন, আমিও জানি;—কাশীতে ভূত থাক্‌তে পারে, কিন্তু পুরুত কাকা,. সেখানে স্বয়ং "ভূতনাথ"ও ত্রিশূল খাড়া করে, বসে আছেন, আমি যাবো পুরুত কাকা"।

পুরোহিত ঠাকুর শোকে দুঃখে একমত বিহ্বল হইয়া পড়িতেছিলেন, তা ছাড়া তথাকথিত বাবুদের পৈশাচিক কাণ্ডে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন,—তিনি কহিলেন, "আমি চিরকাল দেখে এসেছি এ বংশে দয়া মায়া একটা নেই বল্লেই হয়, তোদের বসত বাড়ী—বাড়াবি বলে কি অনাথাকে শিশু পুত্র সহ রাস্তায় দাঁড় করাবি? ধর্ম্মে সইবে?—দেখি একবার শেষ চেষ্টা করে!"—

বিধবা কহিলেন; "দরকার নেই পুরুত কাকা, আপনি কেন এ সকল কথা তুলে লাঞ্ছিত হবেন? এ গাঁয়ের যদি কেউ উচিত কথা কইতে পার্ত্ত, তবে "দেনা দলিল" একদিনে বাতিল হয়ে যেত পুরুত কাকা, আমি কাশীতেই যাবো, সেখানে আমার মামা কাজ করেন, তাঁকে চিঠি লিখেছি, দু' একদিন মধ্যেই মামাত ভাই সুবোধ আমায় নিয়ে যেতে আস্‌বে, বাবা বিশ্বনাথ যা করেন! তবে একটা ভিক্ষা আছে পুরুত কাকা, শ্বশুরের স্থাপিত দেবালয়ের সেবা পূজার ভার আপনার উপর রইল, যদি দেবতা বিগ্রহ বাবুরা ফেলে না দেয়, তবে আপনি পূজো কর্ব্বেন বলুন, ! আর যদি ফেলেই দেয়, আপনি কুড়িয়ে নিয়ে নিজের ঘরে রেখে দেবেন বলুন, ? আমি আপনার কন্যা, এই হার ছড়া যদিও আমার শেষ সম্বল—আমি দেবসেবার জন্য রেখে গেলাম পুরুত কাকা, এতে অমত কর্ব্বেন না দোহাই আপনার পিতৃদেবের"।

পুরোহিত ঠাকুর বালকের মত কাঁদিয়া উঠিলেন,—ঝি মাটীতে গড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল।

(২)

"না বাবা হলো না'!

"তা জানি পুরুত কাকা, তবু আপনি বল্‌ছিলেন, স্বীকার করেছিলাম,—এ যে হবে না, সে যে সোজা মেয়ে নয়, এ আমি অনেক দিন আগে থেকেই জান্‌তাম, ! আমি কি আর না জেনে শুনে ঘরের টাকা খরচ করে আদালত করেছি" ?

ক্রোধ মিশ্রিত গর্ব্বে যোগেন্ বাবুর মুখ ও চোখ লাল হইয়া উঠিল, পুরোহিত ঠাকুর প্রমাদ গণিলেন, তবু সাহস করিয়া কহিলেন—"একি সইবে" ?—

"কি সে" ?—

"ধর্ম্মে" !—

"ধর্ম্ম দেখিয়ে শাসাতে এসেছেন পুরুত কাকা ?—খুড়ো মহাশয় বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলেন, নয় খানা বাড়ী মর্টগেজ রেখে, আর আর মহাজনদের টাকা শোধ করে দিয়েছিলেন আমারই বাবা, ; তার থেকে খুড়ো মহাশয়ের প্রায় সকল সম্পত্তি বিক্রী হয়ে যায়, বাকি থামার খানা বাড়ী যা রয়েছে এতো বিক্রী করেও বাবার ঋণ—আদায় হবে না, পুরুত কাকা। তবু শুদ্ধ খানা বাড়ীটাইত চাচ্ছিলাম, অন্ততঃ অর্দ্ধেকটা দিলেও যে আমার দালানটা উঠে যেত। সে ধাঙ্গড়ের মেয়ে তাও দেবে না, টাকাও দেবে না, আমি তবে কি দান খয়রাত্ কর্ত্তে বসেছি ?—আপনি তারই পক্ষ হয়ে ধর্ম্মের ভয় দেখাতে এসেছেন আমাকে"—ক্রোধে যোগেন্ বাবুর শরীর কাঁপিতে লাগিল, "রাগ্ করলে বাবা, ? তুমিত জান, কি উদ্দেশ্যে তোমার পিতৃদেব তোমার খুড়ো মহাশয়ের সম্পত্তি বেনামীতে 'মর্ট্গেজ্' রেখে ছিলেন,—তিনি আজ নেই তোমার খুড়োও মরে স্বর্গে গেছেন, দেখ্‌তে দেখতে নিশিকান্তও শিশু পুত্র আর স্ত্রীকে রেখে চোখ বুজ্‌ল, আজ্ তারা রাস্তায় দাঁড়াবে, একি হয় বাবা ?"

এইবার যোগেন্ বাবু একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন, তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "পুরুত কাকা, রায় বংশের পুরুতগিরি

করে যদি পেট্ না ভরে, তবে আর মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে পেট্ ভর্‌বে? নিশিকান্তের বিধবার পক্ষ হয়ে সাক্ষীগোপাল, সাজ্‌লেও রাত্‌কে দিন কর্‌তে পার্ব্বেন্ না, এখনও ধর্ম্ম আছে এখনো চন্দ্রসূর্য্য উঠ্‌ছে" !—

এইবার বৃদ্ধ পুরোহিতের ক্রোধের সঞ্চার হইল, তিনি অনেক চেষ্টায় সেই ক্রোধ সংবরণ করিয়া কহিলেন, "যোগেন্, বাবা, স্বার্থ কি দুনিয়ায় এতই বড় জিনিষ যে তার জন্য বাপ্‌কেও মিথ্যাবাদী সাজা'তে হবে? বিষয় কি এতই বড় যে তার জন্য জ্ঞাতি ভ্রাতৃজায়া অনাথা বিধবাকে ভিটে বাড়ী উচ্ছন্ন করে দেশ ছাড়া করতে হবে? সত্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন কর্‌তে গিয়ে হিতৈষী গুরুজনের মর্য্যাদাও লঙ্ঘন করতে হবে? এ হয় না. বাবা, আমি জানি, তুমিও জান, এ বিষয় নিশিকান্তের। নিশিকান্তের বিধবাকে দেশছাড়া করো না, তাদের বিষয় তাদের ডেকে দিয়ে দাও তুমি, তোমার স্বর্গগত পিতা তোমায় আশীর্ব্বাদ কর্ব্বেন; ঈশ্বর খুসি হবেন্, দেশ তোমায় ধন্য ধন্য কর্ব্বে। কিসের অভাব তোমার যোগেন্? বরেন দাদাত লক্ষ টাকার জমিদারী তোমার জন্য রেখে গিয়েছেন, ওদের যে কিছুই নেই বাবা"—বৃদ্ধ আশান্বিত নেত্রে যোগেন বাবুর মুখের দিকে তাকাইয়া কোন' ভরসা না পাইয়া দাঁড়াইলেন।

যোগেন্ বাবু মনে মনে কতকটা দমিয়া গিয়াও কৃত্রিম সাহসে জোরের সহিত বলিয়া উঠিলেন—"সাবধান পুরুত কাকা, বাবার বয়সী বলে মান্য করে চ'লি বটে, কিন্তু ধৈর্য্যেরও একটা সীমা আছে, আপ্‌নি আজ যে মিথ্যা কথা আমার সম্মুখে বলে গেলেন,—আর কারো কাছে তা বল্‌বেন না, ভাল হবে না' বলে দিচ্ছি। রায় বংশের পুরুত্‌গিরি করে খাচ্ছেন

সেই ভাল; নিশিকান্তের বিধবার পক্ষ হয়ে একটা মামলা তৈরী করে ফাউ মারতে চাচ্ছেন, সেটা হবে না বলে দিচ্ছি; পারেন্ ত নিশিকান্তের বিধবাকে বাধ্য করে দিন, দশ বিঘে ব্রহ্মত্র দিতে রাজি আছি—যান্—এখন"—বলিয়া যোগেন্ বাবু দ্রুতপদবিক্ষেপে বাহির হইয়া গেলেন।

সেই কোঠায় একাকী দাঁড়াইয়া বৃদ্ধ পুরোহিত ক্রোধে ও ঘৃণায় কাঁপিতে ছিলেন,—তাঁহার মনে হইতেছিল ধরিত্রী যেন তাঁহার পায়ের নীচ হইতে সরিয়া যাইতেছিল, আকাশের সূর্য্য যেন অগ্নিবর্ষণ করিতেছেন, রৌদ্র তপ্ত-ক'একটা পাখীর কণ্ঠস্বর যেন উৎপীড়িতের মর্ম্মভেদী চীৎকারের মত কাণে আসিতেছে,—তাঁহার মনে হইল নিশিকান্তের বিধবার কোলের শিশুটীকে কাহার নির্দ্দয় হস্ত যেন টানিয়া ছিনাইয়া লইতেছে—এ আর্ত্তনাদ তাহারই শুষ্ক ক্ষীণ শিশু কণ্ঠের!—

(৩)

"নায়েব মশাই," !

"আজ্ঞে মহারাজ!

"পুরুত, নিশিকান্তের বিধবার কাশী যাওয়ায় বাধা দিয়ে একটা মামলা করবার চেষ্টা করছে শুনছি,—তাদের সাবেক প্রজা জীবন, রতন, দয়াল এরা বিধবার বাড়ী পাহারা দিচ্ছে,—আর স্বয়ং পুরুত, সেই বাড়ী দিনরাত আগলে বসে আছেন,—এর মানে" ?—

যোগেন বাবুর বাক্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ নায়েবের সতর্ক দৃষ্টি তাঁহার মুখের উপর নিপতিত হইয়া সহসা নামিয়া আসিল, বৃদ্ধপ্রভুর মুখের ভাব

লক্ষ্য করিয়া ভীত হইলেন, কিন্তু তিনি অনেক দিনের নায়েব, সুতরাং একটু ব্যক্তিত্ব রক্ষার চেষ্টা করিতে উদ্যত হইয়া ধীরে ধীরে কহিলেন—

"সবই শুন্‌ছি মহারাজ, তবে মাম্‌লা হলে,"—

বাধাদিয়া যোগেন বাবু কহিলেন,—"মাম্‌লা হলে আপনিও কি নিশি-কান্তের বিধবার পক্ষ সমর্থন কর্ব্বেন" ?—

"আমি করি আর না করি—কেউ কেউ"—

উত্তেজিত স্বরে যোগেন্ বাবু কহিলেন,—"রায়পুরে কার দশটা মাথা, যোগেন্ রায়ের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয় ? আপনি এই গুরুতর ব্যাপারে দেখ্‌ছি অনেকটা উদাসীন ; তা হলে চল্‌বে না, আমি এর প্রতীকার চাই।—পুরুত ঠাকুর বড় বেড়ে উঠেছেন, আপনি এর গতিবিধি লক্ষ্য রেখে যথোচিত প্রতীকার কর্ব্বেন্ বলে দিচ্ছি—টাকার জন্য আমার জমিদারী পণ !—আর জীবন, রতন, দয়াল এরা ক্ষুদ্র বেচারী,—তবু এদের শাসন চাই, পার্ব্বেন কিনা বলুন আপ্‌নি" !

বৃদ্ধ নায়েব এইবার একেবারে হতাশ্বাস হইয়া পড়িলেন, অনেক চেষ্টায় মাত্র একবার বলিতে যাইতেছিলেন—"দেশের লোকেত জানে—মহা-রাজের নিন্দা"—চোখ্ ঘুরাইয়া ধমক দিয়া যোগেন্ বাবু বলিয়া উঠিলেন, "চুপ্ করুন নায়েব মশাই, আমি মাইনে দিয়ে আম্‌লা পুষ্‌ছি জমিদারী করবার জন্য, উপদেশ নেবার জন্য নয় !—বলুন আপনি আমি যা যা চাই—আগেও যা যা বলেছি—তা পার্ব্বেন কিনা ?—বলুন আপনি ?"

বৃদ্ধ একেবারে দমিয়া গেলেন। আর প্রতিবাদ করিবার সাহস হইল না, অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলিতে হইল "হ্যাঁ পার্ব্বো", কিন্তু কণ্ঠ বড়

শুষ্ক, বুক বড় কাঁপিতেছিল, স্বর বড় নাচু হইল, তথাপি বৃদ্ধ বলিতে বাধ্য হইলেন "হ্যাঁ পার্ব্বো, তবে ফৌজদারি কর্ত্তে হবে অনেক, টাকাও খরচ হবে অনেক"—

বৃদ্ধ মাটীর দিকে মুখ করিয়া বসিয়া রহিলেন, কিয়ৎক্ষণপরে যোগেন্ বাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্বগতোক্তির মত বলিতে লাগিলেন— "নায়েব মশাইই যদি বলেন, টাকা মিথ্যা, পুরুত ঠাকুর ত চাল্ কলার বামুন, বল্‌তেই পারে। আজ্ বাবা বেঁচে নাই, বৃদ্ধ নায়েব মশাইও আজ আমার প্রতিকূল—আমার বরাতেরই ফের দেখ্‌ছি"!

বৃদ্ধ নায়েব এবার একটু উৎসাহিত হইয়া বলিলেন "ভাব্‌বেন না মহারাজ, আমি প্রাণপণে আপনার কার্য্য উদ্ধার কর্‌বো—নিশিকান্ত বাবুর বিধবাকে আমি একমাসের মধ্যে বাড়ী ছাড়াবো,—কর্ত্তা নেই বলে কি রামকান্ত দাসও মরে গেছে"?—

বাবুর মুখ আনন্দদীপ্তিতে ভরিয়া গেল, তিনি গুণ গুণ করিয়া একটা শ্যামা সঙ্গীত আওড়াইতে লাগিলেন, যদিও তাঁহার তৎকালের ক্ষীণ রাগিণী তাঁহার নিজেরই কানে নিতান্ত বেসুরো ও বীভৎস শুনাইতেছিল—।

নায়েব গভীর চিন্তার অভিনয় করিয়া "দুর্গা দুর্গা" বলিয়া বার দুই তিন তুবি ধ্বনি করিতে করিতে উঠিতেছিলেন—যোগেন্ বাবু একটু হাসিয়া কহিলেন—"পুরুতের বড় বারন্ত হয়েছে, বুঝেছেন?"

নায়েব কহিলেন, "তা বটে, তবে কিনা, ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ—স্বর্গীয় কর্ত্তার আমলের লোক—"

একটু হাসিয়া যোগেন্ বাবু কহিলেন, "তা আপনার কাজের সাহায্য কর্‌বার জন্য 'চক্কোত্তি' মশাইকে দিচ্ছি—তিনিও ব্রাহ্মণ,—ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে ধূল পরিমাণ হয়ে যাবে, তিনি নূতন লোক, তা আপ্‌নি কিছু ভাব্‌বেন না, 'চক্কোত্তি' মশাইকে ডেকে আন্‌তে হুকুম করে দেখ্‌বেন তিনি বেঁধে নিয়ে আস্‌বেন—আপনার কিছু আট্‌কাবেনা"! "মহারাজের হুকুম"—এই বলিয়া নায়েব ধীর পদবিক্ষেপে চলিয়া গেলেন, ইত্যবসরে চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রবেশ করিয়া বাবুকে নমস্কার জানাইয়া এমন একটা বিচিত্র ভঙ্গীতে দাঁড়াইলেন যে বাবুর মানসিক অবস্থা তখন বিশেষ গুরুতর থাকিলেও তিনি একটু না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না।

একটু অনুগ্রহের সুরে কহিলেন, "এই যে চক্কোত্তি মশাই, দেখুন আপনিই কিন্তু এই বিপদে একমাত্র ভরসা,"।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় গলিয়া গেলেন, প্রায় মাটীতে লুটাইয়া কৃতজ্ঞতা জানাইতে যাইতেছিলেন বাধা দিয়া যোগেন বাবু কহিলেন,—"আগে পুরুত ঠাকুরকে চাই"।

"তার জন্য ভাবনা নেই মহারাজ! ব্রাহ্মণকে আমার ভয় নেই, ব্রাহ্মণকে জব্দ কর্‌তে পার্‌লে আমার আনন্দ আরও বেশী হয়!—বিশেষ গুরু পুরুত শ্রেণী, আমরা চাক্‌রী করি বলে, একটু নাক সিট্‌কান্ হয়,—দেখ্‌বেন মহারাজ, তিনরাত পার হবে না। চাক্‌রি করি—চাক্‌রি কি তোদের করি, না আমার মুনিবের করি?—মুনিবের জন্য ধর্ম্ম ত তুচ্ছ, প্রাণ যায় সোভি আচ্ছা।—যত সব্ বেইমান্।—

"যান্ আপ্নি" বলিয়া যোগেন বাবু অন্দরে চলিয়া গেলেন, চক্রবর্ত্তী মহাশয় উৎসাহের বেগে কয়েক লাফেই নায়েব মহাশয়ের সঙ্গ লইয়া তাঁহাকে পরামর্শ গিলাইতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। বৃদ্ধ নায়েব এই ব্রাহ্মণ কুলাধমের পৈশাচিক পরামর্শে শিহরিয়া উঠিলেন! সেই মুহূর্ত্তে চাকুরী ত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য তাঁহার মন একবার রুখিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু বৃদ্ধ বয়সের দ্বিতীয় পক্ষের ভোগ বিলাসের নিয়মিত সরঞ্জামের স্মৃতি তাঁহাকে টুটি টিপিয়া ধরিল। নায়েব মহাশয় অগত্যা চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কথা শুনিয়া সায় দিতে দিতে বাসা পর্য্যন্ত পৌছিলেন।—

৪

"মা তোমার গহনা আর কাপড় চোপড় বেচে মাত্র পাঁচশ টাকা হয়েছে, আমার একটা ব্রহ্মত্র যা তোমারই শ্বশুরদের দেওয়া তা বেচে দেড় হাজার টাকা পেয়েছি—বাকি শ'তিন চার টাকা হইলেই আদালতে দাখিল করে দিয়ে ভিটা বাড়ী খালাস করতে পারি—তারপর দেখ্‌বো আমার মাকে কে মুখের কথা বলে"—বৃদ্ধ পুরোহিতের চক্ষু উৎসাহে জ্বলিয়া উঠিল, মুখে আনন্দজ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল।—

বিধবা কহিলেন, "আপনি এত করছেন পুরুত কাকা? অভাগিনীর জন্য নিজের ব্রহ্মত্র বিক্রি করে টাকা এনেছেন? চারশ টাকার জন্য আট্‌কাবেনা, আমার দক্ষিণের ভিটার ঘর খানা বিক্রি করুন, তাতেই এটাকা হয়ে যাবে!"—

"তোমায় ভিটা শূন্য কর্‌বো না মা, চারশত টাকার জন্য আমি অন্য বন্দোবস্ত কর্ব্বো"

সহসা দয়াল আসিয়া হাত যোড় করিয়া কহিল, "মা"—

"কেন দয়াল" ?

"প্রজা কি পেটের ছেলে নয় মা" ?---

"পেটের ছেলে নয় কেন বাবা, তোমরা আমার পেটের ছেলের চেয়েও বেশী,—আজ যে আমি তোমাদেরই জোরে শ্বশুরের ভিটায় দাঁড়িয়ে" ! বিধবার চোখ জলে ভরিয়া উঠিল,—তিনি দয়াল, জীবন ও রতনের দিকে একটা স্নেহ কৃতজ্ঞতা পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ঘোম্‌টা টানিয়া দাঁড়াইলেন,—

"নাও মা চারশ টাকা আমরা তিন জনে যোগাড় করে এনেছি, দোহাই তোমার শ্বশুরের, দোহাই তোমাব সোয়ামীর, এ টাকা, ছেলেদের দেওয়া টাকা, তুলে নেও মা, নইলে আমরা হত্যা হব"।

একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ও বিস্ময়ে বিধবার বুক 'দুর দুর' করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, বৃদ্ধ পুরোহিত একটা অস্ফুট আনন্দধ্বনি করিয়া সঙ্গে সঙ্গে টাকাগুলি তুলিয়া লইলেন, তিনি আপনার মনে বলিতেছিলেন, কে বলে কলিতে ধর্ম্ম নেই ? ঈশ্বর তুমি আছ বলেইত দিনরাত্ হচ্ছে"।

বিধবার চোখে জল পড়িতেছিল, তিনি কহিলেন,—"বাবা সব,— তোমরাও যে আমাব মত গরীব, এত টাকা কোথা থেকে আন্‌লে ? তোমাদের ছেলে মেয়েদের যে কষ্ট হবে বাপ সব !"

জীবন কহিল "কষ্ট হবে ? গেরস্ত আমরা, তোমার শ্বশুরের দয়ায় বাড়ী

জমি বাগান, হাল গোরু কি নেই আমাদের? আমরা রাজার হালে আছি মা, আজ তুমি খোকা বাবুকে নিয়ে রাস্তায় বেরুবে;—রায় বংশের বউ পরের দ্বারে যাবে, একি আমরা দেখ্‌তি পারি মা? এই টাকা এনেছি যদি লাগে আরও দেবো।"

"আরও দেবে?—বাপ সব, তোমরা জান না, এ অভাগিনীকে টাকা দিয়েছ শুনলে বাবুরা তোমাদের কি লাঞ্ছনা কর্ব্বেন,—পুরুত কাকা, আপনিও সাবধান হবেন, এ পরোপকার নিষ্ফল হবে না পুরুত কাকা, এর প্রায়শ্চিত্ত নাকি আপনাকে কর্‌তে হয়—এ যে ঘোর কলিকাল পুরুত কাকা"!—

"আমি গ্রাহ্য করি না মা,—বিষয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হবে হোক্, বামুনের ছেলে ভিক্ষা করে খাব,—ঘর বাড়ী পুড়িয়ে দেয় দিক্, গরীবের ছেলে গাছ তলায়' থাক্‌বো,—এ বয়সে মারধর কর্ব্বার আর সাহস পাবে না, ওঁদের যে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি, তবে আর ভয় কি মা?"—জীবন প্রভৃতি চেঁচাইয়া উঠিল,—" আমরাও ভয় করি না মা,—পুরুত ঠাকুরদার যা দশা আমাদেরও তাই হবে—আমরাও গেরস্তের ছেলে,—না হয় ভিন্ন দেশে গিয়ে হাল চষে খাবো"—।

বৃদ্ধ পুরোহিত কহিলেন, টাকাগুলো আজই দাখিল করে দেবো তবে, আসি মা"—

বিধবা কিছু বলিতে পারিলেন না, কেবল চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে মনে মনে জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। সকলে বাহির হইয়া গেলে, খোকাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কি জানি কেন তাহার মুখে

চোখে চুম্বনের পর চুম্বন করিতে লাগিলেন, তথাপি চোখের জল বন্ধ হইতেছে না দেখিয়া বালিসে চোখ রাখিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, ঝি ততক্ষণ গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত ছিল।

---

(৫)

"মহারাজ, মহারাজ!"

"একি চক্কোত্তি মশাই যে—কি সংবাদ।"—

"বোধ হয় এতক্ষণে হয়ে গেছে"। শুনিয়া যোগেন্ বাবু শিহরিয়া উঠিলেন,—চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মুখে একটা পৈশাচিক গর্ব্বের হাসি, চোখে একটা দানবের তীব্রদৃষ্টি, তিনি সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, "আপনিও ভয় পেলেন মহারাজ?—আপনিত ব্রাহ্মণ,—নায়েব মশাই কায়েতের ছেলে কিনা, তাই ব্রহ্মহত্যার আভাস পেয়ে বোধ হয় এতক্ষণ, দেশ ছেড়ে গিয়েছেন,—তাই বলে আপনিও"—

যোগেন্ বাবু আরও উদ্বিগ্ন, ভীত হইয়া কহিলেন, "ব্রহ্মহত্যা"? পুরুত কাকাকে কি মেরে ফেলেছেন?"—

"তিনি মরেছেন কিনা তা এখনও ঠিক বল্‌তে পারিনে, তবে এত আয়োজনের পরেও তাঁর বেঁচে থাকা ঠিক্ নয়! তিনি পড়ে গোঁঙাচ্ছিলেন,—জীবন, দয়াল আর রতন এসে তাঁকে, চেঙ্গারি করে আড্ডা বাড়ীতে নিয়ে গেল,—মহারাজ, যা মজাটা হয়ে ছিল!"—

"নিশিকান্তের বাড়ীতে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ, তারই ডাক্ নাম আজ কাল আড্ডাবাড়ী, যত বদ্‌মাসের আড্ডা"! চক্রবর্ত্তী মহাশয় একটু হাসিলেন।

যোগেন বাবু যতই উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল হইতেছিলেন, চক্রবর্ত্তী মহাশয় ততই গর্ব্ব অনুভব করিতেছিলেন;—"এবারও যদি বেঁচে যায় তবে বুঝ্‌বো হ্যাঁ—চাল কলার তাবিপ আছে বটে"। "কোথায় কি করেছেন?"

"বড় পুকুরের কোণে, একটু আঁধার ছিল, সেখানে তিন জন পল্মার পেড়ে লেঠেল নিয়ে আমি লুকিয়ে থাকি; বাবাজিত চলেছেন, আহার করে আসবার জন্য বাড়ীর দিকে—অম্‌নি ঝপাঝপ্ লাঠি পড়্‌ল, —চেঁচিয়ে উঠ্‌তে চাচ্ছিল, আমি মুখ গলা চেপে ধরলাম, নান্নু সর্দ্দারকে বল্লাম, পৈতেটা দে ব্যাটার ছিড়ে,—ব্যাটা কিন্তু বামুন বলে ভড়্‌কে গেল, ভাব্‌লাম, এ পৈতের জোরেইত এত ধাষ্টামো, দিলাম টান্"।

"আপনিই ছিড়ে ফেল্লেন?"—

"শুনুন এরপর মজাটা, পৈতে ছিড়েছি না যাদুধন, একেবারে বোবা, আর মুখে ধর্‌তে হলো না, চিৎ করে ফেলে এরপর মুসলমান দিয়ে মুখে থুথু ঝেড়েছি—প্রস্রাব কর্‌তেও হুকুম দিয়েছিলাম, এরি মধ্যে এরা এসে পড়্‌লো, চলে এসছি—"

"ভাল করেন নি চক্কোত্তি মশাই, গিন্নি শুনেও ভয় পাবেন এতটা"—

বাধা দিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিলেন,—"তা তিনি ভয় পেলেও পেতে পারেন, তিনিত আর ঠিক বামুন নন্, নারায়ণ শিলা ছোঁবার অধিকারত তাঁর নেই, তাইত!—এই যে নায়েব মসাই এসেছেন, কই পালালেন না নায়েব মশাই"?

নায়েব প্রবেশ করিতে করিতে কহিলেন, "হ্যাঁ পালাবার জন্যই এসেছি, তোমাদের সংসর্গে আকাশ বাতাস বিষাক্ত হয়ে উঠেছে, মহারাজ এতটা আপনি কর্ব্বেন যদি জান্‌তাম্, তবে তখনই চাক্‌রী ইস্তাফা দিতাম,— চক্কোত্তি মশাইই আপনার যথার্থ যোগ্য কর্ম্মচারী, তিনিই থাকুন, আমার ইস্তাফা পত্র মঞ্জুর হয় হুজুর !"

"নায়েব মশাই পুরুত কাকা কি মারা গেছেন? তিনি কি নেই?" ---আবেগ আতঙ্কে যোগেন্ বাবুর স্বর জড়াইয়া আসিল,—তিনি অনেক কথা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু পারিলেন না, বৃদ্ধ নায়েব কহিলেন, "না মহারাজ এখনো মরেন্ নি, আমি এইমাত্র শুন্‌লাম, সংবাদ পেয়ে রাণী মা পাশের বাড়ীতে ছুটে গিয়ে কুল পুরোহিতের সেবা কচ্ছেন, আর কেঁদে চোখ্ ফুলাচ্ছেন"।—

যোগেন্ বাবু ও চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের চোখে চোখে মিলন হইল, উভয়েই নিরাশ হইয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

নায়েব কহিলেন,—"আর পারছি না মহারাজ এ ব্রহ্মহত্যার পাপ আমাকেও স্পর্শ কর্ব্বে; এত অত্যাচার—এত অবিচার, ঐশ্বর্য্যের এত মত্ততা, ধর্ম্মের গায়ে সয়না মহারাজ"—

"নায়েব মশাই ভয়ে অস্থির হয়ে উঠেছেন মহারাজ"—"ভয়ের কথা বলোনা ব্রাহ্মণ, এ জমীদারীর পত্তন থেকে রামকান্ত দাস। সাহেবের সঙ্গে লড়াই করেছি, দারোগার সঙ্গে লড়াই করেছি, গ্রামের গ্রাম্ বিদ্রোহী প্রজার ঘর বাড়ী নিজের হাতে জ্বালিয়ে দিয়েছি—ভয় করেনি, কিন্তু এমন অধর্ম্ম আর কখনও হয়নি,—এমন নিরপরাধ ব্রাহ্মণ,

কুল পুরোহিত,—না না, তবু যদি বিষয়টা সত্য হতো, আমি যাই মহারাজ" ।—

যোগেন্ বাবু এবার খুবই দমিয়া পড়িলেন, তিনি নায়েবের পথ আগ্‌লাইয়া হাতে ধরিয়া কহিলেন, "নায়েব মশাই ভাল হোক্, মন্দ হোক্ যা ঘটেছে তার আর চাড় নেই, এখন আমায় খুনের দায়ে রেখে আপনি চলে যাবেন" !

নায়েব একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, "না মহারাজ আমি জানি আপনাকে খুনের দায়ে পড়্‌তে হবে না, বৃদ্ধ পুরোহিত কখনও আপনার বিরুদ্ধে মামলা কর্ব্বেন না, সর্ব্বস্বান্ত হলেও না, মরে গেলেও ওয়ারিশ-দের নিষেধ করে যাবেন" !—

"কি করে জান্‌লেন ?"

নায়েব একটু হাসিয়া কহিলেন, "এতটুকু জান্‌তাম বলেই কর্ত্তাদের আমলে আদরযত্ন পেয়েছি, এখন না হয় চক্কোত্তিদের জয় জয়কার" "আমায় মাপ করুন নায়েব মশাই !"—

যোগেন্ বাবুর কাতরতা দর্শনে বৃদ্ধের হৃদয় নরম হইল, তিনি কহি-লেন, "মহারাজ, পুরুত ঠাকুর কি ধাতের লোক তা আপনারা জানেন না, আমি জানি,—নিশিকান্তের বিধবার পক্ষ হয়ে "ফাপরে" মোকদ্দমা চালাবার জন্য সরকারী উকীল পরামর্শ দিয়েছিলেন, সুবোধ বাবু সব বন্দোবস্তও করেছিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ পুরুত ঠাকুর এই কেলেঙ্কারী নিয়ে আদালতে যেতে কিছুতেই সম্মত হন নি, সুবোধ বাবু রাগ করে চলে যান্—বৃদ্ধ নিজের ব্রহ্মত্র বিক্রী করে ডিক্রীর টাকা দাখিল করে-

ছেন, রায় বংশের কলঙ্ক তবু প্রকাশ হতে দেননি, রায় বংশ তাঁর এত প্রিয় এত আপনার" !—

"নায়েব মশাই !"—যোগেন্ বাবুর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, মাত্র বড় বড় চোখ দুটী ছাপাইয়া ধারার পর ধারা স্রোতে অশ্রু গড়াইতে লাগিল।

৬

"কেন এ সর্ব্বনাশ কর্ল্লেন পুরুত কাকা, আমিত সাবধান হতে বলেছিলাম, এ যে—জেনে শুনে আত্মহত্যা কর্ল্লেন পুরুত কাকা, এ হত ভাগিনীর জন্য" ! বিধবা চীৎকার করিয়া উঠিলেন—।

অবসন্ন বৃদ্ধ পুরোহিত ধীরে ধীরে কহিলেন, "আমি যে ভাব্তেও পারিনি মা বরেন্ দাদার ছেলে যোগেন্ আমার গায়ে হাত তুলবে ! মুসলমান দিয়ে আমার জাত মারবে এ যে কল্পনারও অতীত সত্য। হায় মা, তোমার কথাশুনে যদি একটু সতর্ক হতেম্, তবে আজ খেয়াঘাটে দাঁড়িয়ে রায় বংশের ঘাড়ে এ কলঙ্কটা চাপিয়ে যেতে হতো না,—রক্তটা কি পড়্ছে মা" ? "পুরুতকাকা, রক্তটা এখন বন্ধ আছে, আর কত পড়্বে ? রক্ত কি আর দেহে আছে যে আরও পড়্বে ? পুরুত কাকা, পুরুত কাকা—আপনার এ রক্তের এক একটা কণা যে আমার বাছার বুকে এক একটা বজ্র হবে"—বিধবা আর বলিতে পারিলেন না, মাটীতে পড়িয়া আছড়াইতে লাগিলেন। বৃদ্ধের জীর্ণ শরীরে আঘাত-গুলির প্রত্যেকটা ক্ষত বিধবার মর্ম্মে মর্ম্মে বেদনার জ্বালা ছড়াইতেছে—

এ আঘাত,—এ অপঘাত যে তাঁহারই জন্য! হায় অভাগিনি,—এতদিন নিজের বিপদকে তুচ্ছ করিয়া সংসারের সহিত সংগ্রাম করিয়াছ, আর আজ বিপন্নের সাহায্যকারীর বিপদে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলে?

"বৌমা কি চলে গেলেন"?

বৃদ্ধের এই কোমল আহ্বানে জমিদার পত্নী ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তিনি বৃদ্ধের পদতলে বসিয়া এতক্ষণ তাঁহারই পাদুখানি বুকে করিয়া অজস্র পতিত চোখের জলে ধৌত করিতেছিলেন, বৃদ্ধের যদি সাময়িক মোহ না জন্মিত, তবে এ বিস্মৃতি ঘটিত না, ঘটিতে পারিত না। জমিদার গৃহিণী সেই যে প্রথম হইতে একাসনে বসিয়াছেন এ পর্য্যন্ত স্নান বা আহার কিছুই করেন নাই, স্বামীর এই পৈশাচিক ব্যবহারে পুত্রকন্যা ও স্বামীর অমঙ্গল আশঙ্কায় তাঁহার হৃদয়ে দারুণ ভয় ও গ্লানির সঞ্চার হইয়াছে, তিনি নিজের রক্ত দিয়াও যদি বৃদ্ধের রক্তের অভাব দূর করিতে পারিতেন, নিজের প্রাণ দিলেও যদি বৃদ্ধের প্রাণরক্ষা সুনিশ্চিত হইত, হা ভগবান্ এমন কি হয় না?—

"কেঁদনা মা, রায় বংশের লক্ষ্মী তোমরা, তোমাদের জন্যই এ বংশের নাম আজও আছে"।—

জমিদার গৃহিণী এবার চীৎকার করিয়া কাদিয়া উঠিলেন, অথচ কোন কথাও মুখে ফুটিয়া বলিতে পারিলেন না, এ বড় গুরুতর শাস্তি! আজ তাঁহার বাড়া দুঃখী কে? তাঁহার স্বামীর নিন্দায় দেশ ভরিয়া উঠিয়াছে, বৃদ্ধের একবিন্দু রক্তপাতে তাঁহার স্বামিপুত্রকন্যার, তাঁহার রাজার মত সংসারের এক একটা অংশ যে জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে

বলিয়াই তাঁহার মনে হইতেছিল! সেই কুল পুরোহিত, যাঁহাকে পিতার মত ভক্তি করিয়াছেন,—আজ তিনি তাঁহারই চোখের সাম্‌নে নিঃসহায় শিশুর মত মৃত্যু শয্যায় পড়িয়া হাঁপাইতেছেন,—তাঁহারই লুব্ধ স্বামীর নৃশংস অত্যাচারে;—এতে যে কিছুমাত্র বলিবার নাই, যদি বলিবার থাকিত, পা ধরিয়া ক্ষমা চাইবার মতও যদি কিছু আজ তাহার থাকিত, তবে বুঝি এতটা যন্ত্রণা হইত না, ভোগেও যার পরি-সমাপ্তি নাই সে শাস্তি বাস্তবিকই দুর্ব্বহ!

"বাবা কেমন আছেন বৌদি!"

পুত্রের কণ্ঠস্বর শুনিয়া বৃদ্ধ চক্ষু মেলিয়া তাকাইলেন এবং কহিলেন, "ভাল আছি বাবা!—এতক্ষণ কোথায় ছিলে?"

"জেলায় গিয়েছিলাম"—

"জেলায় কেন বাপ্?"—বৃদ্ধের মুখ শঙ্কা ও ঔৎসুক্যে যুগপৎ বিষণ্ণো-জ্জ্বল হইয়া উঠিল, পুত্র নীরব, বৃদ্ধ পুনরপি কহিলেন, "জেলায় কেন গিয়ে ছিলে বাপ? ডাক্তার ডাক্‌তে? আমি কি মর্ব্বার সময় তোর ডাক্তারি ওঁষুধ খাবো—? ধোয়া বাঁধাত এখানকার ডাক্তারই কচ্ছে,—পাগল"। বৃদ্ধ একটু হাসিলেন।

"ডাক্তার ডাক্‌তে নয় বাবা, ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবকে সংবাদ দিতে"।—বৃদ্ধ চমকিয়া উঠিলেন,—"ম্যাজিষ্টর সাহেবকে সংবাদ দিতে? কেন?" "কেন"?—"ইংরেজ রাজত্বে লাঠির সাহায্যে জমিদারী চলেনা, অত্যাচারী দের মাত্র এই কথাটা বুঝিয়ে দিতে"।—

বৃদ্ধ মহাবিপদে পড়িলেন, বিরক্তি সহকারে বলিয়া উঠিলেন, "একি

করেছিস্ মূর্খ ? এযে সর্ব্বনাশ করেছিস্!—রায় বংশের হাতে দড়ি দিবি আমার ছেলে হয়ে" ?

"বাবা রায় বংশের লাঠি কি বৃদ্ধ কুল পুরোহিতের মাথার সম্মান রেখেছে ? শক্তিহীন বলে দুর্ব্বল বলে চোখের সাম্‌নে বৃদ্ধ পিতার এ অপমান, এ মর্ম্মান্তিক অপঘাত দেখ্‌ছি—প্রতীকারের সামর্থ্য নেই বলে কি রাজার সাহায্য নিয়েও একবার অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াব না ? বাবা আমি আতুর ঘরে কেন মলেম না"। যুবক পুরোহিত পুত্র রুদ্ধ আবেগে ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, তাঁহার চোখের জলে বুক ভাসিয়া যাইতেছিল।—

বৃদ্ধ পিতা পুত্রের এই হটকারিতা দর্শনে নিতান্ত দুঃখিত হইলেন, তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস তুলিয়া ত্যাগেব সঙ্গে সঙ্গে কহিলেন, "ভাল করনি বাপ, রায় বংশের কলঙ্ক কীর্ত্তন, উপকারীর অপকার চেষ্টা বংশোচিত হয় নি খোকা,"—

উত্তেজিত কণ্ঠে পুরোহিত পুত্র কহিলেন,—"আপনি কি অপরাধ করেছিলেন বাবা, যার জন্য আজ আততায়ীর মৃত্যু দণ্ড আপনারই মাথায় পড়্‌ল ? এ অত্যাচারে জীবন, পরাণ ছোটলোক, এরাই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে, আমি তাদের প্রশ্রয় দেইনি, দিলে রায়পুর আততায়ীর রক্তে স্নান করে উঠ্‌ত, আমি বৈধ উপায়ে রাজদ্বারে বিচার প্রার্থনা করেছি—এঁকি আমার অপরাধ হলো ? আমি হতভাগ্য সন্তান বলে আপনার এদশা এখনো চোখে দেখ্‌ছি—উঃ" !—

যুবক প্রাণের আবেগে অকৃতার্থ ক্রোধে, মাটীতে পড়িয়া কাঁদিতে

লাগিলেন,—বৃদ্ধ কোন দিকে কর্ণপাত না করিয়া দৃঢ় কণ্ঠে পুত্রকে আদেশ করিলেন,—"যাও খোকা, এখনই সাহেবকে আস্‌তে বারণ করে আসগে, এদেহের রক্তমাংস রায় বংশেরই অন্নে পুষ্ট, আজ যদি রায়বংশ তার খানিকটা নিয়ে তৃপ্ত হয়, আমার আক্ষেপ নেই পুত্র, বরং ঋণের কতকটা শোধ করে যেতে পার্‌ছি বলে হাল্কাবুকে যাত্রা কর্‌তে পার্ব্বো—ওঠ, যাও এখনি যাও! এসে আমার কাশী যাত্রার ব্যবস্থা কর, যদি যথার্থ পুত্র হও, তবে এসময়ে তাই কর, যাও"—

"বাবা সাহেব বোধ হয় অর্দ্ধেক রাস্তা এসে পড়েছেন,—তিনি স্বয়ং তদন্ত কর্ব্বেন"—

"কি করেছিস্ মূর্খ! তোকে ইংরাজী লেখাপড়া শিখিয়েছিলাম এই কর্ত্তে। অক্ষম ব্যাধিগ্রস্ত দুর্ব্বল হস্ত, এক কণা মানের জন্য একটুকরা স্নেদের তৃপ্তির জন্য দ্বারে দ্বারে বাড়িয়ে দিতে? আর বিদ্যামার্জ্জিত ভাষার সাহায্যে নিজের ঘরের কুৎসা, পারিবারিক অত্যাচার, পরের করুণা উৎপাদনেব জন্য কাঁদনির সুরে গেয়ে বেড়াতে?—ছি; ছি; ছি!'

"অক্ষমের এ মহত্ত্বের এ ত্যাগের কোন মূল্য নেই পিতা"—"মহত্ত্ব চিরকালই মহত্ত্ব, ত্যাগ চিরদিনই ত্যাগ, অক্ষমের সংসর্গে সে মলিন হয় না বাপ্! তুমি জান না, এবংশের মান অপমানের সঙ্গে আমার বংশের মান অপমানের সংবন্ধ কত নিবিড়! এস বাপ্‌ধন, সাহেবকে নিষেধ করে এস গে, যাও বাবা, নইলে শুদ্ধ এই আক্ষেপে আমার মৃত্যু হবে, কাশী যাওয়া হবে না,—যাও এস বাপ্"!

যুবক এইবার প্রকৃতই বিপন্ন হইলেন, যদিও বৃদ্ধের যুক্তি তর্ক মোটেই তাঁহার মর্ম্মস্পর্শ করিতেছিল না।

বিধবা একটু অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "পুরুতকাকা"—

বাধা দিয়া বৃদ্ধ কহিলেন, "এতে কথা কয়োনা মা, জান না আজ কার হাতে দড়ি পড়্‌তে যাচ্ছে; যোগেন্ যদি অপদস্ত হয়, এবংশে তবে আর রইল কে? কে আর এবংশকে মান্‌বে বল, এই শিশু-পুত্রকে নিয়ে এখনো ঘর করছ মা কাব ভরকে? এক দিনের কলহের ফলে বাইরের অত্যাচার দশদিক্ থেকে এসে তেমোদের বিঁধবে মা!"

পুত্র আবার কহিলেন, "কিন্তু অত্যাচারীর শাস্তি ভগবানের অভিপ্রেত"।—

বৃদ্ধ পুনরপি কহিলেন,—"ভগবানের অভিপ্রেত কার্য্য ভগবান্ কর্ব্বেন, আমরা আপনার অত্যাচারীজনকে শুদ্ধ ক্ষমা কর্‌তে পারি বাবা—শুদ্ধক্ষমা, বুক ভরা ক্ষমা আর প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ। এতেওকি যোগেনের মঙ্গল হবে না,—এতেও কি সে হারা পথ খুঁজে পাবেনা"?—

সহসা বেগে যোগেন্ বাবু ও নায়েব মহাশয় সেই ঘরে বৃদ্ধের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন—যোগেন্ বাবু উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে ও কম্পিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"ক্ষমা, ক্ষমা, পুরুতকাকা, আপনার বুক ভরা ক্ষমা আর প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ আজ আমার একমাত্র ভিক্ষা!"—

যোগেন্ বাবু বৃদ্ধের পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, জমিদার গৃহিণী একটু সরিয়া ঘোম্‌টা টানিয়া তেম্‌নি বসিয়া রহিলেন, আর

ফোপাইয়া ফোপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তৎকালের ক্ষণিক নিস্তব্ধতার বুকের উপর দিয়া একটা নীরব শোকের উল্কা চলিয়া গেল, বিধবা ভাসুরকে দেখিয়া ঘোম্‌টা টানিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন,—খোকা তখনও তাঁহার কোলে একটা 'বল্‌' লইয়া আপন মনে খেলা করিতে ছিল। এই বিষণ্ণ গৃহের অন্ধকারের মধ্যে মাত্র তাহারই ছোট হাসিটী তারার মত মিট্‌মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছিল!

নায়েব কহিলেন, "পুরুত ঠাকুর দা"! বৃদ্ধ নায়েবের চোখ জলে ভরিয়া আসিল, কণ্ঠ গদ্‌গদ্‌! "পুরুত ঠাকুরদা, খোকার যদি এমন অপরাধ হ'তো, সে কি আপনার ক্ষমা পে'তোনা, সে কি আপনার আশীর্ব্বাদ পে'তোনা? আপনি যে বংশের মুরব্বি"! "যোগেন্‌কে আমি ক্ষমা করেছি নায়েব মশাই"!

"ক্ষমা করেছেন? পুরুত কাকা, পুরুত কাকা, একালে এমন মানুষও জন্মে? ক্ষমা পেয়েছি? খোকা, ভাই আমার, তোর হতভাগ্য দাদাকে তবে তুইও ক্ষমা কর! সাহেবকে ফিরিয়ে নিয়ে যা ভাই, রায় বংশের এরূপর আর মুখ দেখানো চল্‌বে না ভাই!"—

"যাও খোকা,—ছেলে মানুষ কিছুই বুঝে না!"

যুবক পুরোহিত পুত্র উঠিয়া গেলেন। "নায়েব মশাই আপনিও যান্‌"। বৃদ্ধের অনুরোধে নায়েব মহাশয়ও উঠিলেন। ইতি মধ্যে ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া বলিয়া গেলেন 'এবার বোধ হয় বেঁচে যাবেন'!

আশ্বস্ত হইয়া যোগেন্‌ বাবু বিধবাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন "বৌমা, আমি তোমার স্বামীর বড় ভাই, আজ অপরাধীর মত তোমার কাছে ক্ষমা

চাচ্ছি বৌমা, তুমি আমায় ক্ষমা কর, আজ থেকে এ খোকা আর তোমার সম্পূর্ণভার আমার হাতে রইল, এ বাড়ীতে আমি দালান উঠাতে চাচ্ছিলাম, সে দালান উঠ্‌বে বৌমা; কিন্তু আমার জন্য নয়, এই খোকার জন্য!—এস দিকি বাবা", ? ঝি আনিয়া খোকাকে বাবুর কোলে দিল—যোগেন্ বাবু শিশুর মুখ চুম্বন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, আমার এমন সোণার পদ্মকে রাস্তায় ফেলে দিতে চেয়েছিলাম? আমি কি রায় বংশধর না চণ্ডাল?—বৌমা, বল তুমি ক্ষমা কর্‌লে? আর আদেশ কর আজ থেকে তোমাদের সম্পূর্ণ খরচ পত্র, দায়িত্ব, ভাবনা সব আমার, এ ভিটায় আমি দালান তুলে দিচ্ছি ছমাসের ভিতর, বল বৌমা"—যোগেন বাবু অনুতপ্তের দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন,—অপরাধী আসামীর মত হাকিমের শেষ হুকুমের অপেক্ষায় কাণ পাতিয়া রহিলেন।

বিধবা ঝিকে কাছে আসিতে ইঙ্গিত করিয়া তাহারই মারফতে যে কথাগুলি বলিলেন তাহা শুনিয়া যোগেন্ বাবু বিস্মিত, স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, জগতের একটা নূতন আলোক মণ্ডিত মহত্বোজ্জ্বল রাজ্যের সোণার কবাট আজ তাঁহার চোখের সাম্‌নে খুলে গেল। কথাগুলি এই —"বল ঝি আমি ঠাকুরের দাসীমাত্র, আমার কাছে ক্ষমা চাওয়া তাঁর সাজে না, তিনি আর আমায় অপরাধী কর্ব্বেন না, তিনি যদি খোকার ভার নেন, অভিভাবক হন, সেত খোকার পরম সৌভাগ্য, আমার দায়িত্বও কমে যায়!"

খোকা যে রায় বংশেরই একটা ছোট চাড়া, ওকে বাঁচিয়ে রাখা যে ওঁরই কর্ত্তব্য ঝি! আর ঠাকুরকে বল, এ ভিটায় দালান তুলে দিতে হবেনা,

না, পুরুত কাকার রক্তভিজা মাটীতে কেউ স্বর্গ তুলে দিতে চাইলেও আমি নিতামনা, তিনি আশীর্ব্বাদ করুন, মোটা ভাতকাপড়ের মধ্যে দিয়েই আমি খোকাকে মানুষ করে তুল্‌বো, আমি গরীবের মেয়ে দুঃখ দৈন্যকে ভয় কর্ত্তে শিখিনি ; বরং তাদেরই সঙ্গে নিষ্পাপ জীবন যাত্রায় গর্ব্ব অনুভব করি, সেই যে "গরীবের গর্ব্ব" !—

নিতাইবাবু।

বিধাতার কলমের কোন্ এক অজ্ঞাত আঁচড়ের ফেরে পাড়াগাঁয়ে জন্ম গ্রহণ করিলেও নিতাইচরণের পৈতৃক অবস্থার জোরে ছোট বেল হইতেই কলিকাতার বোর্ডিংএ থাকিয়া লেখা পড়া করিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। এবং দেখিতে দেখিতে নিতাইচরণ নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিছু-মাত্র 'নড়চড়' না ঘটাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ পর্য্যন্ত দিয়া দস্তুরমত একটি আধাসাহেব বাঙ্গালীরূপে হঠাৎ একদিন পৈতৃক বাসস্থান কামাল-পুরে উপস্থিত হইয়া গ্রামস্থ সকলের বিস্ময়, সম্ভ্রম এবং বিভীষিকার সঞ্চার করিয়া তুলিল। বেশে বিস্ময়,—পাশে সম্ভ্রম, এবং এ দুয়ের সমাবেশে বিভীষিকা! কামালপুরের নিরক্ষরপ্রায় অধিবাসিগণ তাহাদের ছোট বেলাকার দুর্দ্দান্ত শিশুটিকে অকস্মাৎ এমন একটা 'লায়েক' অথচ উদ্ধতবেশ, অদ্ভুত রকমের 'বাবু সাহেব' হইয়া দীর্ঘকাল পরে কামালপুরের বুকে 'তু'পা ফাঁক্' করিয়া সিগারেট্ মুখে দাঁড়াইতে দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। তাহারা বুঝিতে পারিতে ছিল না এটি যথার্থই রামধন ঠাকুরের একমাত্র পুত্র:—সেই চিরপরিচিত 'নিতাই ঠাকুর' কি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখা পড়া যে মানুষকে এমন করিয়া আপন জনের কাছেও অপরিচিতের মত করিয়া তুলিতে পারে; সেইরূপ অভিজ্ঞতামূলক ধারণা তাহাদের ছিল না। তাহারা অনেকেই ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিল না যে এই দারুণ গ্রীষ্মে সমস্ত শরীরে

এতগুলা সার্ট, কোট, জুতা মোজা, হাফপেন্ট, হ্যাট এবং নেকটাই ইত্যাদি কত কিছু জড়াইয়া রাখিবার মত অসাধ্য ব্যাধির প্রকোপ নিতাই ঠাকুরের কোন জায়গাটা আক্রমণ করিয়া 'নাদুস নুদুস' বামুণের ছেলেটাকে এমন তর আড়ষ্ট ও অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিতেছে। আহা, মাথার ঘাম পায় পড়িতে চলিল তবু যদি এই কাপড় চোপড়ের গদীটা একবার খুলিয়া ফেলিয়া পল্লীর বিশুদ্ধ মুক্ত আলোবাতাসের সঙ্গে একটু পরিচয় করিয়া লইবার সাহস পায়। কোন্ নির্ম্মম ডাক্তার নিতাই ঠাকুরের এমন প্রাণান্তকর চিকিৎসার ব্যবস্থা করিল গা?

রামধন চক্রবর্ত্তী কামালপুর গ্রামের একমাত্র পুরোহিত। তাঁহার যজমানগুলি সকলেই একটু অবস্থাপন্ন, ক্ষেতের ধান, পুকুরের মাছ, গোয়ালের গরুর দুধ, শাক সবজি ফলমূল, এসকলের অভাব প্রায় কাহারও নাই। সকলেই নিজেদের জাতীয় ব্যবসা, এবং গৃহস্থীর কার্য্য শ্রদ্ধা ও উৎসাহের সহিত করিয়া থাকে। রামধন চক্রবর্ত্তীরও প্রচুর খামার আছে। তাঁহার ক্ষেতের ফসলে সারাবৎসরের খোরাকী মায় ক্রিয়াকর্ম্ম নির্ব্বাহ হইয়াও প্রায় হাজার টাকা বিক্রী হইয়া থাকে, তা ছাড়া তাঁহার চারি পাঁচশত টাকা মুনফার ব্রহ্মত্রও আছে। লোকে বলে চক্রবর্ত্তীগৃহিণীর হাতে নগদ টাকাগুলিও সুদে আসলে অনেকদিন হইতেই বাড়িয়া বাড়িয়া ইদানীং প্রায় বিশ হাজারের খাতে যাইয়া পৌঁছিয়াছে। গৃহিণীটী বেশ মিঠেকড়া ধাঁজের গোছালো মেয়ে মানুষ, তিনি নিজের ক্ষমতায় মরসংসার স্বামীটীকে মুঠার মধ্যে পুরিয়া আপনার ইচ্ছামত ঘুরাইয়া ফিরাইয়া চালাইয়া লন, এক কথায় তিনি ভাগ্যবতী। ইদানীং

উপযুক্ত পুত্রের গৌরবে আরও অনেকটা স্ফীত এবং শ্রীমন্ত হইয়া উঠিয়াছেন। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে মানুষ হইয়াও আজকাল তিনি যে সকল বড় বড় বিষয়ের সমালোচনা করিয়া মুগ্ধ বিস্মিত প্রতিবেশীদিগের মনে একটা অতি বড় শ্রদ্ধা ও আশ্চর্য্যভাবের সঞ্চার করিয়া দিয়া থাকেন, তাহাতে নির্ব্বিবাদে প্রমাণিত হইয়া যায় যে মা সরস্বতী যখন কাহারও প্রতি দয়া করেন, তখন তাঁহার দয়ার কতক কতক অংশ ধূনিত তুলার মত চারিদিকেও না ছড়াইয়া যায় না,—যদিও তাহা তথাকথিত তুলারই মত লঘু এবং চঞ্চল। যাহা হউক চক্রবর্ত্তী গৃহিণী কিন্তু যাহা যাহা বলিতেন তাহাতে তাঁহার সরলতায়ই প্রকাশ পাইত, তিনি উপযুক্ত পুত্রের মাতৃত্বের গৌরবে গর্ব্বিতা হইলেও সেই গর্ব্ব প্রতিবেশীর মনে, হিংসার সৃষ্টি করিত না, প্রতিবেশীরাও সেই গর্ব্বে যথার্থই গৌরব অনুভব করিত।

গৃহিণী এইবার পুত্রের ভবিষ্যৎ উন্নতির নানামুখী গতি ও পরিণতির চিন্তায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় স্বামী স্ত্রীতে একত্র হইয়া পুত্রের ভবিষ্যত উন্নতির কল্পনা জল্পনা, কদাচিৎ বা এমন বিতণ্ডা জুড়িয়াদিতেন যে মাঝে মাঝে দু'একটী মূর্খ প্রতিবেশী ছুটিয়া আসিয়া লজ্জায় অবাক্ হইয়া যাইত যে তাহারা কি ভুল করিয়াই ছুটিয়া আসিয়াছে—এযে প্রীতি বিতণ্ডা।

চক্রবর্ত্তী গৃহিণী পুত্রের অন্যান্য সৌভাগ্য সমালোচনার সঙ্গে একটী লক্ষ্মী বৌএর কথা উল্লেখ করিতে কখনও ভুলিতেন না। মাঝে মাঝে কর্ত্তাকেও তিনি ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন। নিতাইচরণ কিন্তু এসকল কথায় কাণ দিত না, সে যেন সর্ব্বদাই কি ভাবিত তাহার মন যেন

কোন কিছুতেই বসিত না, মাতা কত যত্ন করিতেন, পিতা কত প্রশংসা করিতেন, আদরে সোহাগে ও সম্মানে সমস্ত কামালপুব গ্রামখানি নিতাইকে জড়াইয়া ধরিয়া আছে, সম্পৎশালিনী পল্লী তাহার সকল সম্পদ উজাড় কবিবা দিয়াও নিতাইকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিতেছে না, নিতাই কি চায়? নিতাই একদিন ছিপে মাছ ধরিবার জন্য গ্রামপ্রান্ত বাহিনী নদীর তীরে যাইয়া অনেক ক্ষণ বসিয়া থাকিয়াও মাছ না পাইয়া বিরক্ত হইয়া চলিয়া আসিল। আর এক দিন শীকার করিবার জন্য বিলে যাইয়া নিষ্ফলতার লজ্জায় ম্লান মুখে ঘরে ফিরিয়া আসিয়া হতাশার স্বরে মাকে বলিল, "মা, আমি দার্জ্জিলিং যাচ্ছি!" মাতা ছেলেকে ঠাণ্ডা করিবাব উদ্দেশে সর্ব্বাঙ্গ সন্নদ্ধ বাঙ্গালী সৈনিকের পোষাক খুলিবার জন্য অনেক ক্ষণ বৃথা প্রয়াস পাইতে ছিলেন, শেষটায় একটু হাসিয়া বলিলেন,—"কিযে তোদের নব্য ভঙ্গিমে, মাথার ঘাম পায় ছুটছে, নাক মুখ একেবারে লাল,—তবু ছাই ছাঁদন দড়ি বাঁধন দড়ি কত!—নিতাইচরণ কিন্তু বিরক্ত হইয়াই উত্তর করিল, "সে তোমাদের অজ পাড়াগাঁয়ে বরদাস্ত হবে না বলেইত দার্জ্জিলিং যেতে চাচ্ছি, ড্যাম্ কামালপুব"!—

মাতা অবাক্ হইয়া পুত্রেব মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন,—তাঁহার মুখের হাসি মুখেই মিলাইয়া গেল!

(২)

বিএ পাস করার সঙ্গে সঙ্গেই সম ও অসমশ্রেণীর কএকটী ঘর হইতে নিতাইচরণের শুভসংবন্ধের প্রস্তাব আসিতে লাগিল। রামধন ঠাকুর

লেখা পড়া না জানিলেও বেশ সামাজিক লোক ছিলেন, তিনি দেখিলেন পুত্রের এতাদৃশ উন্নতি না হইলে এসকল ঘর হইতে সংবন্ধ আসিবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না।

সমশ্রেণীর কন্যাপক্ষগণ অনেকেই বেশ অবস্থাশালী, তাঁহারা টাকা পয়সা দিয়া এ যাবৎ বড় বড় ঘরেই মেয়ে দিয়া আসিয়াছেন, আর অসম শ্রেণীর অর্থাৎ রামধন ঠাকুর অপেক্ষা বংশে ও সম্মানে উন্নত শ্রেণীর কন্যাপক্ষ হইতে যে কয়েকটী সংবন্ধ আসিয়াছে, তাঁহারা বর্ত্তমানে অবস্থা হীন হইলেও এক সময় রামধন ঠাকুরের স্পৃষ্ট অন্নভোজনে তাঁহাদের বিলক্ষণ আপত্তির কারণ ছিল। আর আজ কিনা তাঁহারাই উপযাচক হইয়া বিএ পাশ নিতাইচরণের নিকট কন্যাদান করিতে আসিয়াছেন, রামধন ঠাকুর ভাগ্যের এই কশাঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া গৃহিণীর এজলাসে বড় বংশের দরিদ্র কন্যার জন্যই দরখাস্ত পেস করিয়া বসিলেন। গৃহিণী একগাল হাসিয়া মাথা নাড়িলেন, সঙ্গে সঙ্গে রামধন ঠাকুরের মাথাটাও কেমন যেন ঘুরিয়া গেল। গৃহিণীর মতলবটা এই যে মেয়েটী বড়ঘরেরও হওয়া চাই, আবার দেনাপাওনার হক বজায় রাখিয়া উপযুক্ত পুত্রের মুখরক্ষাও করা চাই। গৃহিণী স্বামীর কথার উত্তরে স্পষ্টাক্ষরে শেষ 'রায়' শুনাইয়া দিলেন যে হাকিম হইবার উপযুক্ত ছেলের সঙ্গে নেহাৎ গরীবের মেয়ে মানাবে কেন? তাঁহার সবই চাই, সাত্‌টা নয়, পাঁচটা নয় —মোটেইত একটী রত্ন!

গৃহিণীর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অনেকগুলি যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ রামধন ঠাকুরের ওষ্ঠপ্রান্ত পর্য্যন্ত আসিয়াও সাহসের অভাবে উদরের দিকেই পিছা-

ইয়া গেল। রামধন ঠাকুর বিশেষ কিছু বলিতে পারিলেন না,—একটু বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন।

নিজের বিবাহ লইয়া জনকজননীর মধ্যে নিত্য মতভেদ বা আলোচনার কোন অংশই নিতাইচরণের অজ্ঞাত থাকে না, আলোচনার ক্রমিকবৃদ্ধি এবং শীঘ্রই একটা মীমাংসার সম্ভাবনা বুঝিতে পারিয়া নিতাইচরণ নিজকে মহাবিপন্ন অবস্থায় পতিত বলিয়াই সাব্যস্ত করিয়া লইল। এবং অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিল যে আর লজ্জা বা ভয় করিলে চলিবে না, বিপদে ভীত হওয়া কাপুরুষের লক্ষণ, সুতরাং সাহস করিয়া একদিন জননীর মুখেব উপরে বলিয়া ফেলিল যে সে কোনও পল্লীকুমারীর পাণি-গ্রহণ করিয়া নিজের জীবনটা এমন মাটি করিয়া দিতে কিছুতেই প্রস্তুত নহে, তাহার উপযুক্ত পাত্রী পাড়াগাঁয়ে জন্মে না, কলিকাতার কোনও অবস্থাপন্ন শিক্ষিত লোকের মেয়ে বিবাহ করিতে সে ইচ্ছা করে, এবং তাহার আশা আছে একদিন শ্বশুরের দৌলতে বিলাত যাইয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসিবে। মাতা প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু উত্তেজিত পুত্র তাঁহার মুখের উপর আরও শুনাইয়া দিল যে নিরক্ষর জনকজননীর ঘরে কামালপুর হেন গ্রামে জন্ম গ্রহণ করা তাহার একটা অজ্ঞাত পাপের শোচনীয় প্রায়শ্চিত্ত। ধিক্ এমন নিরক্ষর জনক জননীকে, যাঁহারা একমাত্র বংশধর যে ব্যক্তি ভবিষ্যতে বি, এ, এম, এ, পাশ করিয়া একটা 'যাহাতাহা' হইতে পারে তাহার কিনা নাম রাখেন 'নিতাইচরণ'? ড্যাম "নিতাইচরণ"!

মাতা ত শুনিয়া একেবারে কপালে হাত দিয়া বসিলেন, তিনি মেয়ে

মানুষ অতশত বুঝিতে পারিলেন না, তবু অনেক চিন্তা করিয়াও স্থির করিতে পারিলেন না যে নিতাইচরণ তাঁহাদের উপরে যে সকল অভি-যোগের কথা আরোপ করিতেছে সেগুলি সত্য সত্যই জনকজননীর দোষ কি না! আর "নিতাইচরণ" নামটী কি মধুর নহে? কে বলে মধুর নহে? লক্ষ লোকের কোলাহলের মধ্যেও যদি ক্ষীণকণ্ঠে শুধু 'নিতাই' নামটী উচ্চারিত হয় তবু যে তাহা মায়ের কাণে সুধার সুরে বাজিয়া উঠে।

সংসারে কত হাজার হাজার নাম দিন রাত্রি তাহার কাণে পড়ে, কৈ—এমন মধুর নাম ত আর একটীও নাই! এমন নাম রাখিলে যে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, কৈ গৃহিণী ত এমন কথা আর কখনও শুনেন নাই, যে নিতাইচরণকে পেটে ধরিয়া গৃহিণী এতদিন গর্ব্বে বুক ফুলাইয়া চলিয়াছেন, আর আজ সেই নিতাইচরণই কিনা এমন মা'র পেটে জন্মি-য়াছে বলিয়া নিজের দুর্ভাগ্যসংবন্ধে তাঁহারই মুখের উপর দশকথা শুনাইয়া-গেল। হায়রে মায়ের প্রাণ, শেষটায় গৃহিণী যথার্থই মনে করিলেন যে "আমার নিতুর উপরে আমরা হয়ত সত্য সত্যই অবিচার করিয়াছি"! —সেইদিন গৃহিণীর চোখের জল আর ফুরাইল না।

রামধন ঠাকুরকে নিরালা পাইয়া গৃহিণী কহিলেন—"ওগো শুনেছ, তোমার ছেলে বিলেত যেতে চাচ্ছে, সেনাকি আমাদের মত নতপন্না বউ ঘরে আনবে না"। শুনিয়া রামধন ঠাকুর চোখ ঘুরাইয়া বলিলেন, "না. তা আনতে যাবে কেন, গাউনপরা বিবি ঘরে আনবে! ব্যাটার পাখ্না উঠেছে। পাড়াগাঁয়ে যেন গোবরে পদ্মফুল ফুটেছেন! তার

মত বিএ এম এ সহরে রাস্তায় গড়াগড়ি যাচ্ছে" ! বামধন ঠাকুর কথাগুলি বেশ জোরে জোরেই বলিতেছিলেন, উত্তেজিত কণ্ঠে আরও কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু গৃহিণী তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া ব্যস্তভাবে বলিলেন, "তুমি কর কি ? পাগল হলে ? শুনলে যে এখনি দেশ ছেড়ে চলে যাবে ! "আর দেশ ছেড়ে চলে যাবে" !—এই বলিয়া রামধন ঠাকুর একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেলেন। গৃহিণীর মনটা যেন দমিয়া গেল, তিনি এই পুত্রের কত আশা ভরসা করিয়াছেন, এই পুত্রটী তাঁহার নয়নের জ্যোতিঃ। নব বধূ লইয়া সংসার পাতিবার সাধ তাঁহার মনে ছিল, এখনও যে সে সাধ মাথা উঁচু করিয়াই রহিয়াছে, হায় হায়, এতদিন পরে উপযুক্ত হইয়া ছেলে বলে কিনা পাড়াগাঁয়ের মেয়ে বিবাহ করিবে না ! কলিকাতার মেয়ে —বিবাহ করিয়া শ্বশুরের দৌলতে বিলাত যাইবে, হ্যাঁগা বিলাত গেলে কি মানুষ আবার ফিরিয়া আসে ? গৃহিণীর চোখের জলে বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল, তিনি সেই খানেই মেঝেয় পড়িয়া লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

· চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের স্বস্তি ছিল না, তিনি ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার অন্দরে আসিলেন, গৃহিণীকে সেই ভাবেই মেঝেয় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া প্রৌঢ় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন, কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া গৃহিণীকে হাতে ধরিয়া উঠাইয়া শয়ন কক্ষে লইয়া যাইয়া পুত্রের সংবন্ধে পরামর্শ করিতে বসিলেন। অনেক শোক আপশোষ করার পর—গৃহিণী যাহা বলিলেন তাহার সারমর্ম্ম এই যে—যে ভাবেই হউক এই মাস মধ্যেই ছেলের বিবাহ দিতে হইবে। ছেলে পাড়াগাঁয়ে বিবাহ করিতে রাজি না

হইলে অন্ততঃ সহরেই বিবাহ দিতে হইবে। মা হইয়া তিনি ছেলের মুখের দিকে সুখের দিকে না তাকাইয়া পারিবেন না—কিন্তু বিলাত যাইতে চাহিলে ?—না গো না, প্রাণ ধরিয়া ছেলেকে সাতসমুদ্র তেরনদীর পারে—যাইতে কোন্ মা স্বীকার করিবে ?—বিলাত যাওয়া হইবে না, হইবে না, হইবে না, গেলে গৃহিণী গলায় দড়ি দিয়া মরিবেন! রামধন ঠাকুর আস্তিক ব্রাহ্মণ, পুত্রের অন্যান্য শত প্রকার অনাচার সহ্য করিলে ও বিলাত যাইয়া অখাদ্য কুখাদ্য খাওয়ার মত ব্যভিচার সহ্য করা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইবে বলিয়াই তিনি এ সংবন্ধে অত্যন্ত দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়া দৃঢ়তর স্বরে গৃহিণীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"শোন গিন্নি, আমি নিতাইকে বোর্ডিং এ রেখে ইংরাজী পড়িয়ে একটা মস্ত ভুল করেছি, তা যাই হউক নিতাই আমার একমাত্র বংশধর, গৃহদেবতার একমাত্র সেবক, পিতৃপুরুষের একমাত্র জলপিণ্ডদাতা,—তাকে আমি বিলেত যেতে দিব না, যদি যায় তবে বিলেত থেকে অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে এসে আমার পিণ্ড দেওয়ার' অধিকার যাতে তার না থাকে, আমি তার বিহিত করে যাবো" ! রামধন ঠাকুর হাঁপাইয়া উঠিয়াছিলেন, জোরে একটা নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন "গিন্নি বড় আশার বড় ভোগ ! দেখ নারায়ণ কি করেন"। গৃহিণী কহিলেন "ওগো তুমি রেগে কিছু করোনা,—বাছাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে হাত কর, কি যে ভাবে, কি যে করে ! না বাছাকে আমার কল্‌কাতায় কোন' ডাইনি অযুধ বিসুধই করেছে গা ?"—

রামধন চক্রবর্ত্তী অনেকক্ষণ জিজ্ঞাসুনেত্রে গৃহিণীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—"ও সকল কথা ভাবার এখন সময় নেই, আমি ডাকঘর থেকে আসি।"

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার নিতু কোথা?"

রামধন ঠাকুর একটু হাসিয়া কহিলেন "সেজন্য কিছু ভাবনা নেই গিন্নি, টাউনের দিকে সকাল বেলা গিয়েছে, ফিরে এল বলে, বিলেতই যাও আর দার্জ্জিলিংই যাও রূপচাঁদ না হলে চল্‌বে না, চাবিটী এখনও আমারই হাতে"।

গৃহিণী ঊর্দ্ধদিকে তাকাইয়া হাতযোড় করিয়া কহিলেন "ঠাকুর, আমার ঘরের চাঁদকে ঘরে ফিরিয়ে আন"!

(৩)

ঘর্ম্মাক্তকলেবরে ডাকঘরের ফেরত রামধন ঠাকুর একেবারে শোবার ঘরে যাইয়া—ইঙ্গিতে গৃহিণীকে ডাকিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। দু'খানা ডাকের চিঠি গৃহিণীর হাতে দিয়া শুষ্ক ও ম্লানমুখে চাপা গলায় কহিলেন "পড়ে দেখ"!

গৃহিণী চোখ কপালে তুলিয়া কহিলেন "আমার মরণ, তোমার কি বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ হলো নাকি? আমি আবার পড়্‌তে জানি কবে?" রামধন ঠাকুরের চৈতন্য হইল, তিনি নিজেই পত্র দু'খানা পাঠ করিয়া গৃহিণীকে শুনাইতে লাগিলেন।

১ম পত্র

৭নং বালিগঞ্জ সেকেণ্ড্ লেন,
কলিকাতা।

"প্রিয় নীতিবাবু,—

আপনার পত্র পাইয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম, পল্লীসুন্দরীর স্নিগ্ধ শ্যামল অঞ্চলচ্ছায়াতলে ধরণীর শষ্পকোমল স্নেহ শয্যায় শয়ন করিয়া ঊর্দ্ধে নীল-

নভোমণ্ডলের অসংখ্য তারকা মালার স্নিগ্ধ মধুর দৃষ্টির রসধারায় স্নাত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াও আপনি কেন যে এমন মাতৃরূপিনী জন্মভূমি পল্লীরাণীর সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারিতেছেন না, ইহা আমাদের মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির বুদ্ধির অগম্য।

আপনি কামালপুরের প্রাকৃতিক বর্ণনাব ব্যঙ্গ করিয়া যে কয়টী অবহেলাব আঁক টানিয়াছেন, আমি আমার কল্পনার দূরদিগন্ত প্রসারিণী দৃষ্টির সাহায্যে তাহারই মধ্যে অতি নির্ম্মল প্রাণারাম স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য রাশির একত্র সমাবেশ দেখিতে পাইয়া আত্মহারা হইয়া উঠিতেছি, এমনি একটী মাতৃস্নেহসিক্ত রমণীয় পল্লীর সুধাপূর্ণবক্ষে ঝাপাইয়া পড়িবার জন্য। নীতি-বাবু, আপনি কি ইহারই মধ্যে ভুলিয়া গেলেন—

"সকল দেশের সেরা সে যে আমার জন্মভূমি!"

পরিশেষে আপনার বন্ধুর সবিনয় অনুরোধ এই যে—পল্লীকে সৌন্দর্য্যের কেন্দ্র করিয়া তুলিবার জন্যও অন্ততঃ আপনাদের বিশেষ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যদি সত্যসত্যই উহার সৌন্দর্য্যের অভাব আপনাদের দৃষ্টিতে অতিমাত্র প্রতিভাত হইয়া থাকে, দেশের যাঁহারা বড়, ভবিষ্যতেও যাঁহারা বড় বলিয়া গণ্য হইবেন, পল্লীই অধিকাংশের জন্মভূমি;—পল্লীর উদ্ধারসাধন না করিয়া, তাহার বর্জ্জনমানসে দোষ উদ্‌ঘাটন, আমার বিবেচনায় অমার্জ্জনীয় কৃতঘ্নতা! আশা করি আপনার "সাহিত্যিক বন্ধু"র এই ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। একমত আছি আপনার মানসিক স্বাস্থ্যসংবাদ পাওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব রহিলাম। ইতি—

আপনার স্নেহক্রীত—শ্রীপতি।

পুঃ আপনার 'মানস প্রতিমা'র সংবাদ নীরদ বাবুর পত্রেই অবগত হইবেন। আশা করি বিধিলিপির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশে নিজেই সান্ত্বনা লাভ করিবেন! ইতি—

(২য় পত্র)

৭ নং বালিগঞ্জ সেকেণ্ড লেন,

কলিকাতা।

প্রিয় নীতিবাবু,

এই কয়দিন পার্কের দিকে যাইতে পারি নাই, কাল গিয়াছিলাম, দুর্ভাগ্যবশতঃ আপনার 'মানস প্রতিমা'র সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই, তাঁহার ছোট ভাইটী বেয়ারার সঙ্গে পার্কে গিয়াছিল. সংবাদ লইয়া যাহা জানিলাম তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে এইবারে অনার পাইয়া যিনি বিএ পাশ করিয়াছেন সেই আমাদের চিরপরিচিত বন্ধু নন্দবাবু সরকারী বৃত্তি লইয়া এই মাসেই বিলাত যাইতেছেন, তাঁহারই সঙ্গে রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকার সময় আপনার মানস প্রতিমার শুভবিবাহ। আশা করি ভিত্তিহীন ভালবাসার যবনিকা এই খানেই ফেলিয়া দিয়া, অচিরে একটী গৃহস্থ ঘরের যোগ্য বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়া জীবন সার্থক করিবেন। শেষে নিবেদন এই যে আমরা 'ইতর' শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া আগে হইতেই শুভকার্য্যে মিষ্টান্নের দাবি জানাইয়া রাখিতেছি ইতি—

আপনার বন্ধু,

নীরদ।

পত্র দু'খানা পাঠ করিয়া রামধন চক্রবর্ত্তী বিষণ্ণদৃষ্টিতে গৃহিণীর মুখের দিকে চাহিবামাত্র চমকিয়া উঠিয়া দেখিতে পাইলেন যে গৃহিণীর মুখ পাংশু, চক্ষু নিস্প্রভ নিশ্চল, শরীরস্থির, যেন নিপুণ ভাস্করনির্ম্মিত বজ্রাহত পথিকের নিখুঁত মূর্ত্তি!

রামধন ঠাকুর ভীত হইয়া কম্পিতহস্তে গৃহিণীর অঙ্গ স্পর্শ করিবামাত্র গৃহিণী একটী অস্ফুট চীৎকারে মর্ম্মের সকল বেদনা অজস্র অশ্রুজলের সঙ্গে বাহির করিয়া দিতে লাগিলেন, কিছুক্ষণ পরে গৃহিণী একটু আশ্বস্ত হইয়া আস্তে আস্তে কহিতে লাগিলেন "পোড়াকপাল আমার, আমি যা আশঙ্কা করেছিলাম, তাই কিনা ঘটল গা!—ডাইনি আমার বাছাকে নিশ্চয় অষুধ করেছে গা, ওগো আমার কি হবে গা," গৃহিণীর কান্না আর থামে না। রামধন ঠাকুর মুখ ভার করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ চিন্তার পর রামধন ঠাকুর কহিলেন, "গিন্নি চিঠি দুখানা লুকিয়ে রেখে দাও, নিতাইকে কিছু বলো না, আমি অন্য কাজের অছিলাকরে চট্‌করে কল্‌কাতা থেকে এর আমূল বৃত্তান্ত জেনে আস্‌ছি। হুঁ!—বাপধন আমার সাহেবী ঢংএ বিয়ে করতে রুখেছিলেন! আপাততঃ বাঁচা গেল,—নারায়ণ!"

গৃহিণী একটু আশা ও আশঙ্কার সহিত স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "হ্যাগা নীতিবাবু কে"?

প্রৌঢ় উত্তেজিত স্বরে কহিলেন, "নীতিবাবু, তোমার গুষ্টির বাবা! জবর ছেলে পেটে ধরেছিলে গিন্নি, বিএ পাশ ছেলে নিজেকে 'নিতাই'

নামে পরিচিত কর্‌তে হয়ত লজ্জাবোধ করেন—তাই 'নীতিবাবু' হয়ে দাঁড়িয়েছেন—এরপর না বাবার নাম বদ্‌লান্!—অকাল কুষ্মাণ্ড!"

অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া গৃহিণী কহিলেন "তাইত ভাবি অমন 'উড়্ উড়্' কেন রে বাপু? এতদিন বাদে ঘরের ছেলে ঘরে এসে-ছিস্—আমোদ আহ্লাদ কর্, খাদা, ঘুমো, না কি সব্ বিদ্‌ঘুটে চিন্তে, হা করে বসে বসে খালি ভাববিত মা'র কোলে এসেছিলি কেন?"—জননীর দুই গণ্ড বাহিয়া অভিমানের অশ্রু ঝরিতে লাগিল, আঁচলে অশ্রু মুছিয়া স্বামীর হাত দু'খানি ধরিয়া গৃহিণী কহিলেন, "ওগো আমার মাথা খাও, দোহাই তোমার, কল্‌কেতা থেকেই একটী মেয়ে দেখে নিয়ে এসো, নইলে আমার বাছাকে"—স্নেহশালিনী জননীর কণ্ঠ বাষ্পাবেগে রুদ্ধ হইয়া গেল, সম্ভাব্যমান আশঙ্কায় তাঁহার মুখ বিবর্ণ ও চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল, রামধন ঠাকুর স্নানাহারের জন্য অনুরোধ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

গৃহিণী যথাসম্ভব আত্মসংবরণ করিয়া গৃহকর্ম্মে মনোনিবেশ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এদিকে সাইকেল বাহন টাউন প্রত্যাগত নিতাইচরণ গৃহে আসিয়া পদার্পণ করিয়াই 'পিয়ন' আসিয়াছিল কি না, বাড়ীর জনে জনে প্রশ্ন করিয়া নিরাশচিত্তে বিষণ্ণ মুখে নিজের শোবার ঘরে যাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল।

তাহাকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া গৃহিণীর চক্ষু জলে ভরিয়া আসিতেছিল, তাঁহার শঙ্কাচঞ্চল চিত্ত, এক একবার ছুটিয়া যাইয়া আপনার সন্তানটীকে বুকের নিভৃত স্থানে টানিয়া লইবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিতে-

ছিল, তিনি পরম ধৈর্য্যের সহিত নিজের অশান্ত মনোবৃত্তির আবেগ রুদ্ধ করিয়া করিয়া সংসারের কাজে অবসন্ন স্থূল দেহটাকে টানিয়া টানিয়া খাটাইয়া লইতে ছিলেন, আর এক একবার তাঁহার সতর্কতা-সংযত দীর্ঘশ্বাস, বাহিরের বায়ুমণ্ডলের কম্পন অপেক্ষা হৃৎপিণ্ডের অধিকতর কম্পন জন্মাইয়া তাঁহাকে আরও অবসন্ন করিয়া তুলিতেছিল। ততক্ষণ 'মানসপ্রতিমা'র চিন্তায় বিভোর নিতাইচরণ খাটিয়ার কোলে ক্লান্ত দেহ ঢালিয়া দিয়া কল্পিত নন্দনের পারিজাত কুঞ্জে সুখের দোল খাইতেছিল।

(৪)

৭নং বালিগঞ্জ সেকেণ্ড লেনের একটী দোতলাবাড়ীর নিভৃতকক্ষে নীরদ ও. শ্রীপতিবাবুর সম্মুখে বসিয়া বিস্মিতমুগ্ধ রামধন ঠাকুর নিজের ছেলের বর্ত্তমান জীবনসমস্যার মূল কারণের ইতিহাসটুকু শ্রবণ করিতে ছিলেন, শ্রীপতি বাবু ধীরে অথচ সংক্ষেপে বলিতেছিলেন--

"যা বল্‌ছিলাম, থার্ড্ ইয়ার থেকেই আমরা চারজন এই মেসে আছি। আমি নীরদ বাবু, নিতাই বাবু আর নন্দবাবু বলে একজন ভদ্র লোক। আমাদের চার জনে বেশ ভাব হয়েছিল এক সঙ্গে কলেজে যাওয়া, এক সঙ্গে খেলা করা, বেড়াতে যাওয়া এগুলো আমাদের বাঁধা ছিল, এই যে নন্দবাবুর কথা বল্‌ছিলাম, ইনি এবার ইংলিসে 'অনার' নিয়ে বিএ পাশ করেছেন, নিতাইবাবু অনার পান নি, অমনি পাশ দিয়েছেন। আমরা দু'টী মূর্খ মা সরস্বতীর অনুগ্রহলাভে বঞ্চিত হয়ে পড়ে রয়েছি। যাক্—

নিতাই বাবু।

এই বালিগঞ্জের একজন বড় উকীলের একটী ছেলেও আমাদের কলেজে পড়্ত, এখনো পড়ছে, ছেলেটীর সঙ্গে আমাদের ক'জনেরই বেশ ভাব হ'য়েছিল। ছেলেটী যেমনি দেখ্‌তে শুন্‌তে তেমনি সচ্চরিত্র। ছেলেটীর সঙ্গে এমনি ভাব জমে গেল যে এর পর আমরা প্রায়ই তাঁহাদের বাড়ীতে চা খাবার আড্ডা দিতে সুরু করে দিলাম। আমরা বেশ লক্ষ্য করতাম যে, সেই বাড়ীর ছেলে মেয়েদের সঙ্গে আমাদের নন্দ বাবুরই ভাবটা জমত সকলের চাইতে বেশি, উনি ওঁদের আগেকারই পরিচিত ছিলেন। আমার মশায় এত হেঙ্গাম পোষায় না, আমি দুপেয়ালা চা সাবাড় করেই ঘরের দিকে ছুটে আসতাম, নীরদ বাবুও টিউসনে চলে যেতেন, থাকতেন আমাদের নন্দ বাবু এবং নিতাই বাবু। তাঁরা সেখানে কোন কোন দিন প্রচুর জলযোগের দ্বারা আপ্যায়িত হয়ে আসতেন, কোন কোন দিন বা তানলয়সংযুক্ত রমণী কণ্ঠের সঙ্গীতে মুগ্ধ হয়ে এসে নিজদের সৌভাগ্যের সংবাদে,—বল্‌তে লজ্জা বোধ হচ্চে মাপ্‌ করবেন। নিতাই বাবু কিন্তু উকীল বাবুর অনূঢ়া কন্যার সঙ্গীত আর সৌজন্যে একেবারে মুগ্ধ হয়ে বাসায় ফিরে এসে শুয়ে শুয়ে তারই কথা চিন্তা করতেন, এবং জিজ্ঞাসা করলে তারই কথাটা বার বার আমাদের কাছে গল্প করে বোধ হত অপূর্ব্ব তৃপ্তি লাভ করতেন। নন্দ বাবু কিন্তু লোকটী একটু চাপা গোছের ছিলেন, তিনি এ সম্বন্ধে নিজের কোন মতামত প্রকাশ করা কোন দিনই আবশ্যক বোধ করেন নি। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ব্যাপারটা একটু ঘনিয়ে এল; আমাদের মেসের খানিকটা দূরে একটা পার্ক আছে, আমরা সেই পার্কে প্রায়ই বেড়াতে যেতাম, মাঝে মাঝে

দেখ্‌তাম উকীল বাবুর সেই মেয়েটী তার মেজো ভাইটীর সঙ্গে হাত ধরাধরি করে পার্কে হাওয়া খেতে আস্‌ত, তাকে দেখেই কিন্তু আমাদের নিতাই বাবু কোন না কোন অছিলা করে নিকটে গিয়ে গল্প যুড়ে দিতেন, সেই ছেলেটীও বেশ সরল চিত্ত, হাস্য আনন্দে নিতাই বাবুর সঙ্গে বেশ বন্ধুতার পরিচয়ই দিতেন, মেয়েটীকেও অনেক কথাতেই যোগ দিতে দেখা যেত। নন্দ বাবু কিন্তু সহজ সরল ভাবে আমাদেরই মত নিজের খুসি মাফিক্ বেড়িয়ে বেড়াতেন। নিতাই বাবুর চাঞ্চল্য অনেক সময় আমাদেরও মনে বিরক্তির উদ্রেক করত সত্য, কিন্তু তাঁকে আমরা কোন কথা বল্‌তে সাহস পেতাম না।” ইহার পর নীরদ বাবু বলিলেন, “আমি বরাবর লক্ষ্য করেছি মেয়েটী নন্দ বাবুকেই সমীহ করে চলেছে, নিতাই বাবুকে নয়। নন্দ বাবুকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখেছে আর নিতাই বাবুকে দেখেছে সাধারণ বন্ধুর মত! কিন্তু নিতাই বাবু সর্ব্বদাই ভাবতেন মেয়েটী তাঁকেই সব্‌চাইতে বেশী ভালবাসে। এই খানেই নিতাই বাবুর ভুল।” রামধন ঠাকুর একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। শ্রীপতিবাবু বলিতে লাগিলেন “একদিন রাত্রি ৮টার পর নিতাই বাবু বাসায় এসে একেবারে আমার কোঠায় গিয়ে হাজির। তাঁর মুখ আনন্দোজ্জ্বল, চক্ষু স্নেহসংকুচিত এবং কণ্ঠস্বর বাষ্পগদ্‌গদ, আমায় বল্লেন “শ্রীপতি দা আমি যদি বিলেত যাই তবে আমায় মনে থাকবে ত?” আমিত শুনে অবাক্, অনেক সাধ্য সাধনার পর জানা গেল, আমাদের সেই বন্ধু ছেলেটী নাকি আজকে নিতাই বাবুর সঙ্গে গল্প করেছে। নেলার বরকে তাঁদের বাপ বিলেত পাঠিয়ে ব্যারিষ্টার করে আনবেন। তাতেই

নিতাই বাবু।

নিতাই বাবুর আশা হয়েছে যে নেলার বর অন্য কেহ নয় স্বয়ং তিনিই। বিশেষতঃ তাঁর সঙ্গে যখন এমন ভাব মহাশয় বল্লে বিশ্বেস যাবেন না, আমি এত করে তাঁকে বুঝাতে চেষ্টা করলাম যে নেলার বর অন্যকেউও হতে পারে, কিন্তু সেটা তাঁকে কিছুতেই বোঝাতে পাবলাম না, এমন একনিষ্ঠতা আমিত আর কোথাও দেখিনি, এর কয়দিন বাদে নিতাই বাবু একগাল হাসি আর একখানা চিঠি নিয়ে আমার ঘরে এসে উপস্থিত হলেন। চিঠি খানা আমার গায়ে ছুঁড়ে মেরে বল্লেন "এইবার পড়ে দেখ নেলার বর কে?" আমি চিঠিখানা খুলে একনিশ্বাসে পড়ে দেখ্‌লাম এ হলেও হতে পারে। একবার দুবার তিনবার করে চিঠিখানা পড়্‌লাম, চিঠিখানা ছোট, এবারতটা ভুলিনি, বোধ হয় লেখা ছিল—'ডিয়ার নীতিবাবু, আমার ম্যেট্রিকুলেশনের সঙ্গে সঙ্গে এবার আপনারও বি, এ, বাবা বল্‌ছেন, এই বি, এ.র বানানটা নাকি অন্য রকম করে দেবার জন্য তিনি শীঘ্রই চেষ্টা কর্‌বেন, বানানের এদিক সেদিক নাকি আজকাল ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। দাদার সঙ্গে আজ এই কথাটাই হচ্ছিল। ধৃষ্টতা মাপ করবেন। আপনার গুণমুগ্ধা নেলা', সহসা রামধন ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন "আমার ছেলেত নীতি নয় সেত নিতাই চরণ—"প্রৌঢ় নিজের সংশয় ও সিদ্ধান্তটা যাচাই করিয়া লইবার জন্যই এই প্রশ্নটী করিয়াছেন সন্দেহ নাই। উত্তরে শ্রীপতি বাবু মুখটিপিয়া হাসিয়া বলিলেন "আমরাত তাই জানতাম মশায়, একথা আমিও বল্‌ছিলাম। যেই বলা অমনি একটা প্রকাণ্ড রকমের ধমক দিয়ে নিতাই বাবু শুনিয়ে দিলেন যে অসভ্য পাড়াগায়ের তাঁকে যে নামই

দিয়ে থাক্‌না একজন শিক্ষিত মহিলার মুখে সেই নাম কখনও আস্‌তে পারে না। আমাদের মত বর্ব্বর তাঁকে নিতাই চরণ মনে কর্‌তে লজ্জা বোধ না করলেও কলকাতার এটিকেট দুরস্ত একটী ভদ্র মহিলা তাঁকে কখনো নিতাই চরণ বলে ডাক্‌বে দূরে থাক্ ওটা তাঁর মত লোকের যে একটা নাম হতে পারে তা ভাবতেও পারে না! আমরা তাঁকে নিতাই বাবু বলি বটে, তিনি হয়ত ভেবে থাক্‌বেন, ওটা নীতি বাবুরই সোহাগ পরিবর্ত্তন।” শুনেত আমি অবাক্ হয়ে গেলাম। ভাবলাম এ হতেও বা পারে। পরদিন নিতাই বাবুর অবস্থা দেখলাম আর একরকম দাঁড়িয়েছে। ঝি এসে যেই বল্লে ‘নিতাই বাবু খেতে আসুন অমনি তার গালে এক চড় বসিয়ে দিয়ে চিৎকার করে তিনি বলে উঠ্‌লেন, তাঁর নাম নিতাই বাবু নয় নীতি বাবু, আজ থেকে এই বোর্ডিংএ যে তাকে নিতাই বাবু বলে অপমান করবে তিনি তার পরম শত্রু বলে গণ্য হবেন, এই ঘোষণার পরে সকলেই কিন্তু একটা হাসাহাসি করতে লাগল, ঝি মাগীত একেবারে আদালতের পথেই পা বাড়িয়েছিল, মাঝখান-থেকে নন্দবাবু এসে এসকল গোল মিটিয়ে দিয়ে নিতাই বাবুকে ঠাণ্ডাকরে দিলেন। নন্দবাবুর পকেট থেকে ঝি মাগীর টেঁকে কিছু বক্‌সিস্‌ও উঠেছিল, শুনেছি। নন্দবাবু কিন্তু একবার জিজ্ঞাসাও করলেন না মূলে ব্যাপারটা কি? সেই থেকে বোর্ডিংএ আমরা তাঁকে নীতি বাবু বলেই ডেকে থাকি। ১ম নন্দবাবুর মুখ থেকে এই ডাকটা বেরিয়েছিল বলে আর আপত্তির কারণ ছিলনা। যাক্ পরদিন রাত সাতটার পর নিতাই বাবু এসে ভ্রান্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। জিজ্ঞাসা করে

জানলাম নেলার একজামিন কাল হয়ে গেছে, আজকার চারটার ট্রেণে তারা দার্জ্জিলিং চলে গেছে। তখনকার অবস্থা মনে হলে এখনও আমার বুক কেঁপে উঠে, কি যে উদাসভাব, হতাশহৃদয়ের করুণ আর্ত্তনাদ, শংসী সুদীর্ঘ শ্বাস, লক্ষ্যহীন দৃষ্টি—মহাশয়, নিতাইবাবুর জন্ত তখনত আমার একটা বিষম চিন্তা দাঁড়িয়ে গেল, কাছেই আমাদের একজামিন্ সেই জন্যেও চিন্তার মাত্রাটা কম নয়, অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা করলাম বটে, কিন্তু যখনি দেখ্‌তাম নিতাই বাবু একলা বসে কি ভাবছেন, তখনি তাঁকে কাছে বসিয়ে আশ্বাস দান করতাম। এই ভাবে কোনমতে পরীক্ষার দিন কটা পার করিয়ে তাঁকে বহুকষ্টে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছি।" নীরদবাবু কহিলেন "আপনি প্রাচীন লোক, হয়ত বুঝতেই পারছেন না এটা যে কি রকম রহস্য, বল্‌তে কি মশায়, আমরা যে এই কলকাতার ঘাগী—আমরাও সময় সময় অবাক হয়ে যাই"—

রাম-ধন ঠাকুর কি যেন স্মরণ করিয়া কহিলেন "হুঃ! এই জন্যেই বোধহয় বাবাজী বাড়ী যেয়েই একবার দার্জ্জিলিং যেতে বায়না ধরেছিলেন, সেখানে গেলে নাকি বেয়ারাম ভাল হয়! অনেক কষ্টে ধরে রেখেছি মহাশয়, অনেক কষ্টে ঘরে রেখেছি, তাও কি ছাই মন পাওয়া গেল? ফাঁকা ধরটা ধরে রেখেছি; গিন্নিত মাঝখানে একবার কবরেজ ডাকবার জন্যেই ব্যাকুল হয়েছিলেন।" প্রৌঢ়ের চক্ষু ছলছল করিতেছিল!

নীরদবাবু কহিলেন—"কত দিন রাত নিতাইবাবুকে নিয়ে পার্কে কাটিয়ে দিয়েছি তার হিসেব করে কে? থাক্ এসব কথা বলে আপনার কাছে আর লজ্জাহীনতার পরিচয় দিয়ে দরকার নেই। এখন নিতাইবাবুকে

দেখে শুনে একটা বিয়ে দিয়ে দিন, সব চুকে যাবে। কুমারী নেলা আজকেই নন্দবাবুকে মালা দেবে। এই আমাদের কার্ড।" এই বলিয়া নীরদবাবু নন্দবাবুর শুভবিবাহের নিমন্ত্রণ কার্ডখানা বাহির করিয়া রামধন-ঠাকুরের নিকট ধরিয়া দিলেন, রামধন ঠাকুর ইংরাজী কার্ডের একবর্ণও বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন "রেখেদিন ওতে আর কি হবে!" শ্রীপতিবাবু কহিলেন—"কুমারী নেলা, মেয়েটী কিন্তু বেশ দিব্যি রং ছিপছিপে মানান্ সই গড়ন, নাকটী বাঁশীর মত"—"লম্বা,—না?" নীরদবাবুর ব্যঙ্গে শ্রীপতিবাবু বিরক্ত হইয়া কহিলেন "সে তোমার 'ইকনমিক্‌স্‌এর' মাথায় কুলোবে না, যাক্ মেয়েটী কিন্তু চমৎকার সুন্দরী ভট্‌চায্ মশায়,—তবে বয়স্‌টা কিছু বেশী, এইবার ম্যেট্রিকুলেশন পাশ দিয়েছে বেশ গাইতে বাজাতে পারে, শুনেছি কবিতা লিখিতেও বেশ হাত আছে, তবে চাল চলনটা একটু সহুরে আপনাদের পাড়াগাঁয়ে হয়ত সেটা থাপ খেতো না, তবে আমাদের নন্দবাবুর সঙ্গে নেলার বেশ মানাবে, নন্দবাবুত সাহেব হবার জন্যই বিলেত যাওয়ার টিকিট কিনেছেন"।

এতক্ষণে রামধন ঠাকুর একটু দম লইয়া বলিলেন "একটা কথা বল্‌তে চাই, যদি কিছু মনে না করেন এই যে কুমারী 'নেলা' 'নেলা' বল্‌ছেন, এটা কি রকম নাম? এঁরা কোন জাত?" শ্রীপতি বাবু একটু মাতব্বরী সুরে গলা টানিয়া বলিলেন "ভট্‌চায্ মশায় এ কল্‌কাতা সহরে জাতের নিসানা পাওয়ার জো নেই। এখানে বামুন কায়েত নিয়ে জাতভেদ বড় একটা নেই, এখানে দেখ্‌তে পাবেন মোটা মোটা কএকটা জাত এই—ধরুণ সাহেব, বাবু সাহেব, খালি বাবু, কুলি ও কেরাণী; বাবু সাহেবদের

মধ্যেই নাম নিয়ে যত গোল,—আমার মনে হয়—মেয়েটীর নাম 'নীলা' মেমসাহেব বলে বোঝাবার জন্যে বা অন্য কিছু উদ্দেশ্যে বিকৃত করে নীলাকে "নেলা" করা হয়েছে, যেমন কর মশাইকে কার, গোবিন্দ-ভায়াকে গেভিন করা হয় এমনি একটা কিছু মতলবে! এইত আমাদের জাতীয় চরিত্র!"

রামধন ঠাকুর—নীরদ বাবু ও শ্রীপতি বাবুর হাত ধরিয়া বলিলেন—"যা হবার তা হয়েছে,—আপদ চুকেছে, এখন আমায় একটী ভদ্রঘরের হিন্দুভাবাপন্ন মেয়ে দেখে দিন, আমি আপনাদের কেনা হয়ে থাক্‌ব, এই মাসেই বে দেবার যোগাড় করবার জন্য আমি এখনই উঠলাম"—

(৫)

তখনও কামালপুরের পশ্চিমপ্রান্ত বাহিনী ক্ষুদ্র নদীর বায়ু তাড়িত তরঙ্গরাশি সন্ধ্যার শেষ সূর্য্যরশ্মি লইয়া খেলা করিতেছিল। পাখীর কল-কণ্ঠে সারাপল্লীর আনন্দ অভিব্যক্ত হইতেছিল, তখনও দেবালয়ের কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া উঠে নাই, ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বলিলেও আকাশের প্রদীপ সকলগুলি জ্বলিয়া উঠে নাই, তখনো আলো আঁধারে লুকোচুরি চলিতে-ছিল, ঠিক এমনি সময় রামধন ঠাকুর কলিকাতা হইতে রেলপথে নিজগ্রামে আসিয়া পদক্ষেপ করিলেন, রেলপথ একক্রোশ দূরে টাউন পর্য্যন্ত আসিয়াছে সেখান হইতে পদব্রজেই আসিতে হয়, রামধন ঠাকুরও তাই আসিলেন, চট্ করিয়া ঠাকুর প্রণাম সারিয়া লইয়া অন্দরে প্রবেশ করিতে যাইয়াই—গৃহিণীর উচ্চ-রোদনধ্বনি শুনিতে পাইলেন, ত্রস্ত হইয়া নিকটে যাইয়া—

জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা জানিতে পারিলেন, তাহাতে ঠাকুর মহাশয়ের চক্ষুর্দ্বয় স্থির হইয়া গেল, নারায়ণ বলিয়া তিনি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। গৃহিণীর অজস্র অশ্রুজল ও অবিশ্রান্ত রোদনধ্বনির ফাঁকে বহুক্ষণের চেষ্টায় রামধন ঠাকুর যে তথ্য আবিষ্কার করিলেন তাহার স্থূলমর্ম্ম এই যে,—বেলা ১টার সময় নিতাই চরণ স্নান আহার করিয়া ডাকঘরে চলিয়া যায়—এবং তথা হইতে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে গৃহে আসিয়াই পিতার অনুসন্ধান লইবার জন্য জননীর কাছে যাইয়া—জানিতে পারিল যে তিনি এই কতক্ষণ কলিকাতা চলিয়া গিয়াছেন, তখনই নিতাই চরণের মনে গভীর সন্দেহের উদ্রেক হইল, সে প্রথমতঃ চিঠি দুইখানার কথা জিজ্ঞাসা করিলে জননী নিরুত্তর ছিলেন, কিন্তু ডাকঘর হইতে তাঁহার পিতা যে চিঠি দুইখানা আনিয়াছেন পোষ্ট-মাষ্টার বাবু একথা নিতাই চরণকে না বলিয়া কিছুতেই পারেন নাই। চিঠি দুই খানার সঙ্গে সঙ্গেই—পিতৃদেবের—কলিকাতা অন্তর্দ্ধানের মূলে কোন গুরুতর বিষয় নিহিত রহিয়াছে বারবার পরিষ্কার করিয়া বলিবার জন্য নিতাই চরণ জননীকে—বিশেষ পীড়াপীড়ি করিলে পুত্রস্নেহকাতরা জননী অগত্যা সকল কথাই খুলিয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, শুনিয়া নাকি নিতাই চরণ ধূলায় লুটাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কত ইংরাজী কত বাঙ্গালা ছড়া আওড়াইয়া গভীর শোক প্রকাশ করিয়াছিল তাহা মেয়ে মানুষ হইয়া গৃহিণীঠাকুরাণী অত কি করিয়া বলিবেন! শেষটায় বাক্‌স ভাঙ্গিয়া ক এক খানা নোট লইয়া স্নেহের পুত্র কলিকাতার দিকে চম্পট দিয়াছে, বোধ হয় সন্ধ্যার ট্রেণে সে কলিকাতা পৌছিয়া থাকিবে।

বাক্‌স ভাঙ্গার কথা শুনিয়া—রামধন ঠাকুর একটু চঞ্চল হইয়া পড়িলেন,

গৃহিণী বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "সে যা অবস্থা হয়েছিল, আমার টাকা খুলে দেওয়ার তর তার সইছিল না"—গৃহিণী মেঝেয় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন, রামধন ঠাকুর অপরিবর্ত্তিত বেশেই ৮টার ট্রেণ ধরিবার জন্য পা বাড়াইলেন যাইবার সময় বলিয়া গেলেন চিন্তার কোন কারণ নাই, কালকেই তিনি ছেলের সঙ্গে ঘরে ফিরিবেন। ব্যাপারটা যে কি তাহা ঠিক বুঝিতে না পারিলেও বাড়ীর ঝি চাকর এবং দুই একজন প্রতিবেশী শঙ্কিত চিত্তে নিতাই বাবুরই সম্বন্ধে কোন একটা বিপদ্‌জনক ঘটনার অনুমান করিয়া লইতে বিলম্ব করিল না।

সন্ধ্যা ঠাকুরাণীর বড়মেয়ে নিশাদেবী কামালপুরের পুরোহিত বাড়ীর শোক বেদনা ও দুঃস্বপ্নের দীর্ঘশ্বাস গণিতে গণিতে উষার জন্য অপেক্ষা করিতে ল্যাগিলেন।

এ দিকে রামধন ঠাকুর ৮টার ট্রেণ ধরিয়া ১০টায় কলিকাতা পৌঁছিলেন, বিশেষ কিছু চিন্তা না করিয়াই—একেবারে বালিগঞ্জে বোর্ডিংএর দরজায় ঘা দিলেন চাকর দরজা খুলিয়া দিল তিনি বরাবর নীরদ বাবুর ঘরে যাইয়া উঠিলেন, নীরদ বাবু এই কতক্ষণ হইল নন্দবাবুর বিবাহের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া বাসায় আসিয়াছেন, এখনও ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে, রামধন ঠাকুরকে দেখিয়া তিনি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—প্রণাম ভট্‌চায্‌ মশায়, আবার হঠাৎ যে?

নীরদ বাবুর প্রশ্নের উত্তরে রামধন ঠাকুর সমস্ত কথা যথাযথভাবে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "নিতাই আসে নাই?"

"আজ্ঞে তিনিত এখানে আসেন নি ?"

"বিয়ে বাড়ীতে দেখলেন ?"

"আজ্ঞে তাওত দেখিনি ?"

এইবার পুত্রের অপঘাত মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া রামধন ঠাকুর চিৎকার করিয়া করিয়া বালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন, তাঁহার যন্ত্রণামথিত উচ্চ-কণ্ঠের বিলাপধ্বনি কলিকাতার ক্ষুদ্র অংশের নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বাড়ীর সকলের মনে একটা অনিশ্চিত আশঙ্কার সঞ্চার করিয়া দিল, নীরদ বাবুর ঘরে তখন একে একে বোর্ডিংএর সকল ছেলেই আসিয়া জুটিল, সংক্ষেপে নিতাই বাবুর অবস্থা এবং শোকগ্রস্ত বৃদ্ধ পিতার ততোধিক মর্ম্মবেদনার কথা অবগত হইয়া সকলেই—সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিল ; কিন্তু রামধন ঠাকুর সেখানে বসিয়া শোক সান্ত্বনার 'বাঁধিগৎ' শুনিবার প্রতি বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্য না দেখাইয়া নীরদবাবুর হাত ধরিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন, এবং নীরদ বাবুর পরিচিত—'নেলা'র পৈতৃক বাস ভবন বিবাহ বাড়ীর একেবারে মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দুইজনে সেখানকার পরিচিত অপরিচিত সকল স্থান খুঁজিয়া খুঁজিয়া হায়রান হইয়া পড়িলেন, কিন্তু নিতাই চরণের কোন সন্ধানই পাইলেন না। তখন বিবাহ বাড়ীর আলোকমালা আস্তে আস্তে নিভিয়া আসিতেছিল। নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকগণ অনেকক্ষণ হয় চলিয়া গিয়াছেন তাঁহাদেরই ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্য সামগ্রী রাস্তার পাশে স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়া আছে, এত রাত্রে ভিখারীর দল সংবাদ পায় নাই বলিয়া বালিগঞ্জের ঝোপ জঙ্গলবাসী কএকটা শিষ্ট শৃগাল, বিনা বিবাদে ও বিনা

বাক্যব্যয়ে সেগুলির সদ্ব্যবহার করিতেছিল, অবশিষ্ট যাহা থাকিবে তাহা প্রাতঃকালে অনাহূত ক্ষুধার্ত্ত নরনারী পেটের জ্বালায় নিঃশেষ করিবে!

বাড়ীর কর্ত্তা অনেকক্ষণ শয়নকক্ষে বিশ্রামলাভ করিয়াছেন, বাহিরে দুই একটী কর্ম্মচারী গোছের ভদ্রলোক এদিক সেদিক তদারক করিয়া ফিরিতেছিলেন নীরদবাবু কাণ পাতিয়া শুনিলেন, অন্দর মহলের এক প্রান্ত হইতে অর্গেনের মিষ্ট আওয়াজের সঙ্গে রমণীর সুধাকণ্ঠ মিলিত হইয়া বেহাগে বাসর সঙ্গীতের মাধুর্য্য ছড়াইতেছে। সঙ্গীতের ফাঁকে সময় সময় নন্দবাবুর মধ্যমে বাঁধা উচ্চহাস্যের সহিত কতকগুলি নিখাদে বাঁধা সাধা গলার মধুর হাস্য চমৎকার লয় রাখিয়া নৈশ আকাশের বায়ু তরঙ্গের লীলাগতির অনুসরণ করিতেছে। নীরদবাবু কি জানি কি ভাবিয়া অস্ফুটস্বরে 'ভাগ্য' এই কথাটা বলিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন, রামধন ঠাকুরের কি যেন কেন খালিই মনে হইতে লাগিল, নিতাইচরণ আর কোথাও যায় নাই, এই বালিগঞ্জের নৈশ পবনের শব্দ বহন শক্তির সীমা-টুকুর মধ্যে নিরাশপ্রণয়ী নিতাইচরণ কোনা না কোন জায়গায় লুকাইয়া এই আনন্দ যামিনীর মধুর বাসর সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় মর্ম্মে মরিয়া ধূলায় লুটাইয়া কাঁদিতেছে, হায় হায় নিতাই নাকি আত্মঘাতী হয়রে।

নীরদবাবুর টানাটানিতে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও রামধন ঠাকুর—বোর্ডিংএ আসিয়া শয্যা লইলেন, সাঁরা রাত্রি একবারও চোখ বুজিলেন না তাঁহার নিশ্চয় ধারণা হইয়াছে যে যদি নিতাই প্রাণে থাকে তবে বালিগঞ্জের সেই বাড়ীর কাছেই এক জায়গায় না এক জায়গায় সে আছে, দেখিতে দেখিতে রাত্রি শেষ হইয়া আসিল, রামধন ঠাকুর নীরদ বাবুকে জাগাইয়া হাত ধরিয়া

বিবাহ বাড়ীর দিকে লইয়া চলিলেন। তাহার আশায় সারারাত্রির উত্তেজনায় অবসাদে ভোরের দিকে ক্লান্তি নিদ্রায় অচেতন হইয়া তাহার বাছা বুঝিবা কোন পথের ধারে ধূলিশয্যায় পড়িয়া আছে, এই ভোরে গেলেই তাহাকে ধরিয়া আনা যাইবে। নতুবা দিনের বেলা ঘুম ভাঙ্গিলে তাহাকে আর পাওয়া যাইবে না। আশায় বুক বাঁধিয়া রামধন ঠাকুর দ্রুত পাদক্ষেপে বিবাহ বাড়ীর দিকে ছুটিলেন। ঊষার শীতল বায়ুস্পর্শে বৃদ্ধের উষ্ণ মস্তিষ্ক ও তপ্তদেহ অনেকটা সুস্থ হইয়া আসিতেছিল।

(৬)

তখনও নহবতের সানাই ললিতের ঝঙ্কার ঊষার নির্ম্মল আকাশ ভরিয়া তুলে নাই, অনেকগুলি তারা এখনও ডুবে নাই; অনেকগুলি কলি তখনও প্রভাত পবনের সাধাসাধি ঘাড় নাড়িয়া উড়াইয়া দিয়া ঘোমটা টানিয়াই বসিয়া রহিয়াছে ফুটে নাই! যেগুলি ফুটিয়াছে তাহারাও অনাঘ্রাত জীবনের পবিত্রতার গর্ব্বে মাথা উঁচু করিয়াই দাড়াইয়া আছে তখনো নিদ্রালসসুপ্ত ভ্রমরবঁধু হাসিমুখে আসিয়া জুটে নাই। এবং তখনও প্রাতঃসমীরণস্পর্শে মদিরনিদ্রাজড়িতনয়নযুগল দুইহাতের অঙ্গুলিপৃষ্ঠে মুছিতে মুছিতে বালবধূর দল সুখশয্যা ত্যাগ করিয়া উঠে নাই,—কিন্তু আমাদের পরিচিত নন্দবাবু তাঁহার নবসঙ্গিনী 'নেলার' হাতখানি ধরিয়া সেই সময়ই বাড়ীর সংলগ্ন পার্কে যাইয়া পায়চারি করিতেছিলেন। মধুযামিনীর সঙ্গিনী রাগিনীকুলের মোলায়েম অত্যাচারে আর গুমোট গ্রীষ্মের ফ্যানের অসাধ্য গরমের চোটে সারারাত্রি নবদম্পতীর চোখ বুঁজিবার অবকাশ ঘটে নাই, ভোরের দিকে

সঙ্গীনীরা রণে ভঙ্গ দিলে, বাহিরের ঠাণ্ডা হাওয়ার জন্য নন্দবাবুর প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল! 'নেলা'ও যেন কেমন নেতাইয়া পড়িয়াছিল, দুইজনেই চিরপরিচিত আকাশের উন্মুক্ত কোলে, সবুজ ঘাসের মকমলের আস্তরণ দেওয়া পার্কের মাঝে আসিয়া দাড়াইলেন, নন্দবাবু পরিপূর্ণ তৃপ্তির সহিত 'নেলা'র হাত দুখানি ধরিয়া মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, 'নেলা'র দৃষ্টি তখন পার্কেরই এক কোণে একটা ক্রোটনের ঝারের দিকে নিবদ্ধ ছিল, নন্দবাবু সেইদিকে চোখ ফিরিয়া দেখিতে পাইলেন ক্রোটনের ঝারের আড়াল হইতে একজন যুবা তাঁহাদেরই দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। ঊষার আলোকে তখন বিশ্ব উদ্ভাসিত, পূর্ব্বদিক অরুণরাগে রঞ্জিত, পাখীর মধুর কলরবে সারা ধরণী মুখর ও নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। যুবককে নিজেদের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া 'নেলা' একটু ভীত হইয়া নন্দবাবুর পাছের দিকে হটিয়া গেল, নন্দবাবু চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া আতঙ্কে ও বিস্ময়ের সহিত দেখিলেন এবং দেখিয়া চিনিলেন, আগন্তুক যুবক অন্যকেহ নহে তাহাদেরই চিরপরিচিত সহপাঠী বান্ধব নিতাইবাবু! ঈষৎ হাসিমুখে নিতাই বাবুর কুশল প্রশ্ন করিতে যাইয়া নন্দবাবু আরও ভীত বিস্মিত হইয়া দেখিতে পাইলেন নিতাই বাবুর দৈহিক অবস্থা অত্যন্ত বিসদৃশ, মাথার চুলগুলি খাড়া রুক্ষ, চোখ জবাফুলের মত লাল, শরীরের রংটা যেন ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছে যদি একদিন আগেও নন্দবাবু তাহাকে দেখিতে পাইতেন তবে আজকার দর্শনে নিশ্চিতই বুঝিতে পারিতেন যে একটা রাত্রির আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন মহিমায় নিতাইবাবুর চোখদুটী বসিয়া গিয়াছে, নাক খানিকটা হেলিয়া পড়িয়াছে, গালে গর্ত্ত

ধরিয়াছে,—নিতাইবাবু যেন সারারাত্রি মৃতদাহ করিয়া ভোরের দিকে গঙ্গা নাইতে চলিয়াছেন। নিকটে আসিয়া নিতাই বাবু দুই জনকেই নমস্কার জানাইয়া কহিল ভয় নেই, নবদম্পতি! আমি এসেছি তোমাদের শেষ অভিনন্দন জানিয়ে যেতে। কিন্তু 'নেলা' তোমার মধ্যে এমন কুটিলতার বিষ লুকিয়ে রেখেছো জান্‌লে আমি অনেকদিন আগেই সতর্ক হতে পার্‌তাম! হোঃ!

নন্দবাবু এসম্বন্ধে কতকটা বিবরণ একবার নীরদ বাবুর কাছে শুনিয়াছিলেন, তখন তিনি ততটা গ্রাহ্যই করেন নাই, কিন্তু আজ এই নববিবাহিত জীবনের প্রথম ঊষার মাধুরী মণ্ডিত কোলে বসিয়া এমন প্রণয়ীর দুঃস্বপ্ন দর্শন করিবেন বলিয়া কখনো চিন্তা করেন নাই। নন্দ বাবু অনেকটা দমিয়া পড়িলেন, তাঁহার অত্যন্ত দুঃখবোধ হইল, বিষয়টা তখনও তাঁহার সম্পূর্ণ মগজে আসে নাই, একটু ইতস্ততঃ করিয়া 'নেলা'র ভীতি পাংশুল মুখের দিকে চাহিলেন., 'নেলার' সরল চাহনি অব্যক্ত ভাষায় যেন বলিয়া উঠিল ওগো আমি এর বিন্দুমাত্রও অবগত নই! মুখে কহিলেন "নিতাইবাবু আমাদের ভাল বাসতেন, তবে এতটা হবে জানতাম না।"

মিথ্যাবাদীনি এতটা হবে জান্‌তে না? দেখ দেখি এ চিঠিখানা কার? এই বলিয়া নিতাই চরণ পকেট হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া 'নেলা'র দিকে ছুড়িয়া মারিল, নেলা চিঠিখানি কুড়াইয়া লইয়া পাঠ করিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল, "ভুল হয়েছে নিতাই বাবু, আপনার ভুল হয়েছে, এচিঠি আমি লিখেছি সত্য, তবে আপনাকে নয়, আপনার

এই বন্ধুকে।" নিতাই চরণ আরও উত্তেজিত হইয়া—বলিল এখন তাই বটে আমি যে তোমার মোহে পড়ে অনার্স পাইনি! তা যাক্ আচ্ছা, ইনি কি নীতি বাবু?

'নেলা' কহিল "আজ্ঞে হ্যাঁ, ওঁর আসল নাম নিত্যানন্দ বাবু, আমরা ব্রাহ্ম ধরণের মানুষ, আমরা আপনাদের ওসব নন্দ টন্দ পসন্দ করিনে, সোজা নামই আমরা চাই, তাই নীতি-আনন্দ এদুটোয় মিশিয়ে যে নামটা হয়েছে তারই প্রথম ভাগটা আমরা গ্রহণ করিয়াছিলাম—তাতেই ইনি নীতিবাবু নামে আমাদের পরিবারেব সবাইর কাছে পরিচিত ছিলেন, সে আজ যখন থেকে ওঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয়।"

ওঁর নাম কি নিত্যানন্দ বাবু? আমরা যে নন্দবাবু বলেই জান্তাম্। আহা প্রত্যুৎপন্নমতি নারি, নিত্যানন্দ হ্রস্ব ইকার নীতি যে দীর্ঘ ঈকার? 'নেলা' একটু হাসিয়া কহিল, "দুঃখিত হলাম নিতাই বাবু, আপনি ভয়ঙ্কর ভুলকরে এ কষ্টটা পেলেন, আমার চিঠিখানা আবার পড়ে দেখুন এই দেখুন বানানের এদিক সেদিক আজকাল ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়" একথা লেখা আছে কিনা।"

শুনিয়া নিতাই চরণ একটা প্রকাণ্ড রকমের দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "ও! তাই কি?" আজকালকি বর্ণ বিচার আছে নিতাই বাবু? এই বলিয়া নন্দবাবু একটু সমবেদনার হাসি হাসিলেন যে শ্লেষাক্ত নিতাইচরণ উচ্চকণ্ঠে কহিল, বানানের ভুল ধর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য না হতে পারে নন্দবাবু, কিন্তু আমার এ মর্ম্মস্পর্শী ভালবাসা যা আমাকে তিল তিল করে টেনে নিয়ে ওঁরই সঙ্গে এককরে দেবার চেষ্টা করেছে—রাতদিন।

সেটাও কি গণ্য হবার মত কিছু নয়? নারি, আমি তোমায় কতছন্দে কতভাষায় আত্মার কত অনাহত বন্দনা গীতি এ দুবছর পূজা করে এসেছি, ছলনাময়ি, তুমি কি একদিনও তা বুঝ্‌তে পারনি? তুমি কি আমায় বুঝ্‌তে দাওনি—জানি যে”—বাষ্পাবেগে নিতাই চরণের কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া গেল একটু পরে কহিল, আমি যে বড় আশা করেছিলাম আমিই তোমার নীতি বাবু?—

“আপনার ভুল নিতাই বাবু, আপনি চিরকালই আমাদের নিতাই বাবু!” আপনাকে আমি চিরকালই বন্ধু বলে জেনে এসেছি এখনও তাই জানি, বন্ধুমহলে আমাদের চাল চলন একটু উদার, আপনি একে আর বুঝেছেন মাপ করবেন, তবে এখন আসি নমস্কার! এই বলিয়া নন্দবাবুর হাতে ধরিয়া ‘নেলা’ বাহির হইয়া গেল! ‘নেলা’র নৈশ পরিচ্ছদের অঞ্চলপ্রান্ত পায়ের গোড়ায় মাটিতে লুটাইয়া লুটাইয়া মর্ম্মাহত নিতাই চরণের অজ্ঞাতে প্রণয়িহৃদয়কে ভেট লইয়া যাইতেছিল।

প্রণয় বঞ্চিত নিতাই চরণ লজ্জা অপমান ও ক্ষোভে একেবারে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, সে উন্মাদের মত চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, “আমি নিতাই বাবু? ংশ্বাসঘাতিনি নাকি, আমি নীতি বাবু নই? আমি ভুল করেছি? ও!” ততক্ষণ নবদম্পতী আনন্দ মন্দিরের দুইখানি শোফায় বসিয়া ম্লানমুখে হতভাগ্য নিতাই বাবুর ভুলের কথাটাই চিন্তা করিতেছিলেন।

অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া শ্রান্ত নিতাই চরণ ঘাসের উপরে ক্রমে শুইয়া তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িল, এদিকে সারা বালিগঞ্জ খুঁজিয়া খুজিয়া বৃদ্ধ পিতা

নিতাই বাবু।

রামধন চক্রবর্ত্তী নীরদ বাবুর সঙ্গে সেই পার্কে আসিয়া দূর হইতেই একজন যুবককে শয়িত অবস্থায় দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া নিকটে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন—"নীরদবাবু—নীরদবাবু দেখত এটী কে?" আবেগ রুদ্ধ কণ্ঠে নীরদবাবু বলিয়া উঠিলেন "এই যে ইনিই আমাদের নিতাই বাবু।"

জুয়ারি

(১)

তখন রাত্রি ভোর হইয়াছে। চিৎপুরের রাস্তার ট্রামের যাতায়াত আরম্ভ না হইলেও গঙ্গাস্নানার্থী স্ত্রীলোক পুরুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল গঙ্গার দিকে যাইতেছিল আর তথাকথিত নরক প্রত্যাগত দুটী চারিটী যুবা ও প্রৌঢ় ত্বরিত পদে গৃহাভিমুখে ফিরিতেছিল। রাস্তার উপর 'মিউনিসিপ্যালিটির' ময়লাবাহী গাড়ীর শ্রেণী ক্যাচ্ ক্যাচ্ শব্দ করিতে করিতে একপ্রকার ত্বরিত মন্থর গতির কসরত করিতেছিল। সে শব্দে রাস্তার ধারের বড় বড় গাছগুলির ডালে বায়স কুল কর্ণভেদী রবে নিজেদের সত্তা জানাইতেছিল। আর তাহাদের উগ্র কণ্ঠের নীচে নীচে সুর ছড়াইয়া দুচারিটী গায়ন পাখী মধুর গান গাইতেছিল। ঠিক এমনি সময় চিৎপুরের একটা ছোট গলির ভিতর একখানি খোলার ঘরের দরজায় একজন প্রৌঢ় চারিদিকে চাহিয়া—আস্তে আস্তে 'ঘা' দিতেছিল; প্রৌঢ়ের চেহারা লম্বা, কৃশ, মুখমণ্ডল চিন্তা ও বিষাদের রেখায় রেখায় একপ্রকার বিশ্রী দেখাইতেছিল, পরনের কাপড় ময়লা, হয়ত বা দু চারি জায়গায় ছিন্নও হইতে পারে, গায়ের জামা বহুদিনের অপরিষ্কৃত বলিয়া তেলে চট্ লাগার মত দেখাইতেছিল, প্রৌঢ়ের পায়ে শততালি দেওয়া জুত, চুলগুলি রুক্ষ, চোখদুটী ঘুমে ভাঙ্গিয়া আসিতেছিল। প্রৌঢ় আস্তে আস্তে ডাকিল, 'রুম'—রুমি,—রুমেলা!

কে একজন স্ত্রীলোক ভিতর হইতে দরজা খুলিয়া দিল, প্রৌঢ় কিছুমাত্র বাক্যব্যয় না করিয়া—টলিতে টলিতে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। ঘরের ভিতরে সাজ সরঞ্জাম দেখিলে মনে হইবে এখানি একজন গরীব লোকের বাসগৃহ। ঘরের একদিকে দুখানি শয্যা, একখানি মেজেতে, আর একখানি দড়িছানি দেওয়া খাটিয়াতে। খাটিয়ার শয্যার উপকরণ অতি সামান্যের মধ্যে একটু পরিষ্কৃত, মেজের বিছানাটি নিতান্ত ময়লা ও দারিদ্র্য সূচক। ঘরের একপাশে রান্না বান্নার যোগাড়যন্ত্র করা রহিয়াছে, এক পাশের কুলুঙ্গীতে কয়েকটা তৈলের বোতল, দুচার খানি তৈজস ও কিছু চায়ের সরঞ্জাম সজ্জিত। অপরাংশে একটা কুলুঙ্গীতে একটা কেরোসিনের ডিবাবাতি মাথায় কালোপাগ বাঁধিয়া—পলায়নতৎপর অন্ধকারের সহিত লড়াই করিতেছে। ধূয়ায় সারাটা ঘর কালিময় হইয়া গিয়াছে, চালে ঝুলেরও অভাব নাই। স্ত্রীলোকটী আগন্তুকের মুখের দিকে তাকাইয়া নৈরাশ্যব্যঞ্জক দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল, প্রৌঢ় কোন দিকে না তাকাইয়া খাটিয়ায় সুপ্ত একটি ফুট ফুটে কচি মেয়ের পাশে লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল। সে শোয়াটা এমন সহজ এবং উদাসীন হইল যে স্ত্রীলোকটী কোন বাধা দিতে কিংবা কথা কহিতে অবসর পাইলনা। নীরবে চায়ের সরঞ্জামে হাত বাড়াইতে গিয়া শুনিতে পাইল প্রৌঢ়ের নাসিকা ধ্বনিতে সারাঘরখানি কাঁপিয়া উঠিতেছে। স্ত্রীলোকটী কাছে আসিয়া দেখিল প্রৌঢ়ের তথাকথিত পাদুকাযুগল পদ যুগলের স্নেহ বন্ধন খুলিতে পারে নাই। জামার অবস্থাও তাই, মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল ঘুমের মধ্যেও ললাটের শিরাগুলি নানাভাবে কুঞ্চিত।

মুখের ভাব নিতান্ত দুশ্চিন্তাব্যঞ্জক ; নিদ্রা গাঢ় বটে, কিন্তু বুকের ভিতরকার বেদনাগুলি যেন শয্যার চারিপাশে ছারপোকাগুলির মতই তাহার সর্ব্বাঙ্গে কিল বিল করিয়া বেড়াইতেছে।

সে চিরদিন এমন ছিল না,—তার পিতা একজন মধ্যবিত্ত ভদ্র মুসলমান ছিলেন। তাঁর একমাত্র পুত্র "জুমন" কিছু কিছু লেখাপড়াও শিখিয়াছিল, পুত্রের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য বৃদ্ধ পিতা একখানা কেতাবের দোকান করিয়া দিয়া একদিন মক্কার দিকে চাহিয়া শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। বৃদ্ধ গৃহশূন্য ছিলেন, তাঁর পরিবার একমাত্র শিশুপুত্র জুমনকে সংসারে রাখিয়া পরলোক যাত্রা করেন, বৃদ্ধ তখন পেন্‌সন লইতে বাধ্য হন। জুমনকে বুকে পিঠে করিয়া আদরের পর আদর ঢালিয়া দিয়া তবে এতখানি বড় করিয়াছিলেন, লেখাপড়ায় তেমন সুবিধা ছিল না, দেখিয়াই বৃদ্ধ একখানি মাঝারি গোছের কেতাবের দোকান খুলিয়া নিজে কাছে থাকিয়া পুত্রকে ব্যবসায় শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। জুমন ব্যবসায়ে বেশ হাত পাকাইল, মাথাও পাকিতে চলিতেছিল, কিন্তু এমনি সময় বৃদ্ধ পিতার মৃত্যু তাহাকে অন্যপথে লইয়া চলিল। কুসঙ্গে পড়িয়া জুমন জুয়াখেলার আড্ডায় যাতায়াত করিতে লাগিল। জুমনের দোকানের পাশের গলিতে একটা বড় রকমের জুয়ার আড্ডা ছিল, তাহার আশে পাশে আরও কতকগুলি ছোট ছোট আড্ডা ছিল। জুমন প্রথম প্রথম জুয়াখেলাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিত, ভয়ও করিত। চোখের সামনে শত শত ধনী ব্যবসায়ী দুই তিন রাতের মধ্যে রাস্তায় দাঁড়াইয়াছে দেখিয়া জুয়াখেলার নামে জুমনের গা কাঁটা দিয়া উঠিত।

জুমন সঙ্গীদের সঙ্গে কতদিন এই নিয়া তর্ক বিতর্ক পরিশেষে ঝগড়া করিতে বাধ্য হইয়াছে। সংসারে তখন জুমনের এক স্ত্রী ও একটী শিশু কন্যা ছাড়া আর কেহ ছিল না। জুমন রাত্রি দশটায় ঘরে ফিরিত। স্ত্রীর আদরে, শিশু কন্যার আধ আধ কণ্ঠে জুমনের সারাদিনের ক্লেশ কোথায় চলিয়া যাইত। জুমন মাঝে মাঝে স্ত্রীর কাছে গায়ে-পড়া বন্ধুদের আবেদন প্রকাশ করিত, শুনিয়া স্ত্রীর মুখ সাদা হইয়া যাইত, চোখ কপালে উঠিত, শরীরে কাঁটা ফুটিত। সে বেচারী স্বামীর হাতদুখানি জড়াইয়া ধরিয়া খালি একধার হইতে বকিয়া যাইত, "ওগো তোমার পায়ে পড়ি জুয়ার আড্ডায় যেয়ো না; ওগো আমার মাথা খাও, এদের সঙ্গে মিশো না"। জুমন্ তখন স্ত্রীর হাত ধরিয়া একটু বিজ্ঞোচিত হাস্যের সহিত নিজের চরিত্রবত্তা, দৃঢ়তা এবং অভ্রান্ততা অতি সহজেই স্ত্রীকে বুঝাইয়া দিত। সে সময়ে শিশুকন্যা রুমেলার হাস্য কলরব, বিচিত্র হাতনাড়া, অস্ফুট কাকলী দম্পতীর চিত্ত ও চিন্তার গতি অন্যদিকে লইয়া চলিত।

তাহারা তখন নরকের কল্পিত বিভীষিকা ত্যাগ করিয়া শিশুব সর্ব্বাঙ্গে প্রতিবিম্বিত বেহেস্তের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে, তার কণ্ঠে স্বর্গের হুরীগণের মধুর সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে মুগ্ধ বিস্মিতচিত্তে দুজনে দুজনকে এমন নিবিড় ভাবে জড়াইয়া ধরিত, শিশু রুমেলা তখন দুদিকের চাপে সহসা চীৎকার করিয়া উঠিয়া দুজনেরই স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিয়া আবার "খিল্ খিল্" করিয়া হাসিয়া উঠিত। জুমন্ এদের নিয়া যে আনন্দ উপভোগ করিত তাহা স্বর্গীয়! জুয়ার আড্ডার কথা মনে পড়িলে সে শিহরিয়া উঠিত, এবং

ভগবানের নিকট সর্ব্বদা গায়ে পড়া বন্ধুদের বন্ধুতা হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য প্রার্থনা করিত। জুমন্ তার পিতার নেমাজঘরটিকে মক্কার মত পবিত্র মনে করিত। তার পৈতৃক বসতবাটী তার নিকট অতি পবিত্র ও আনন্দধাম বলিয়া গণ্য হইত। তার সংসারটী ছোটখাটগোছের হইলেও দোকানের আয় ও বিবির ব্যয় নৈপুণ্যে সোণার সংসার হইয়াছিল, আর তারই উপরে "মিনার" মত শোভা পাইতেছিল ফুলের তোড়াটীর মত সুন্দর হাস্যময়ী "রুমেলা" !

জুমন্ সংসারে একটা জিনিষ খুব নূতন করিয়া দেখিতেছিল, এবং বিস্মিত হইতেছিল,—তাহা অন্য কিছু নহে সে অনিচ্ছাসত্ত্বেও রুমেলার মধ্যে তার জননীকে এবং রুমেলার জননীর মধ্যে শিশুকন্যা রুমেলাকে দেখিতে পাইয়া উভয়ের আকারে, চেষ্টায় ও ভঙ্গীতে উভয়কে অনুভব করিতে পাইয়া পরম আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইত, সে ভাবিয়া পাইত না— বিশ্বসৃষ্টির কোন্ নিগূঢ় কারণে এ "অসম্ভব" সম্ভবপর হইয়া গেল !— হাঁগা, জুমন্ যা দেখে সেকি সত্য ?—

জুমন্ সকলদিক গুছাইয়া লইয়া যখন বেশ একটু আরামের নিশ্বাস ছাড়িল, সয়তান ঠিক্ সেইসময়ে তাহার বন্ধু বেশে আসিয়া তাহাকে বাগে আনিতে চেষ্টায় লাগিয়া গেল। তরঙ্গবহুল স্রোতে অবাধগতি নৌকা কোন কারণে আট্‌কা পড়িলে অনেক সময় সামলান যায় না, মারা পড়ে— কর্ম্মস্রোতে অবাধগতি জীবন যদি সহসা ভোগে, বিলাসে বা ঔদাস্যে হঠাৎ বাধা প্রাপ্ত হয়, তখন অনেক সময় তাহাকে সামলাইয়া লওয়া কঠিন হয়।

জুমনের অবস্থাও ঠিক্ তাই হইল ; জুমনের পিতাকে সে পাড়ায় সকলে ভয় করিত, সমীহ করিয়া চলিত, বৃদ্ধের সতর্কদৃষ্টি, কড়ামেজাজ, জুমনের সর্ব্বদেহে মনে একটা অক্ষয় কবচের মত সন্নদ্ধ থাকিয়া জুমনকে কুসংসর্গ হইতে রক্ষা করিয়া রাখিয়াছিল। তৎপর প্রবল কর্ম্মস্রোত জুমনকে একটানা ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছিল, কোন বাধা, কোন আট্‌কা তাকে ধরিতে পায় নাই। জুমন কর্ম্মজীবনেও বেশ উন্নতি করিল, কিন্তু যেদিন জুমন সকলদিক দিয়াই নিজকে যথার্থ নিরাপদ মনে করিয়া একটু "আয়েস" করিয়া লইবার জন্য পা ছড়াইয়া, চোখ বুঁজিয়া, দেহ এলাইয়া দিল, এতটুকু সময়ের জন্য, সেই সামান্য ভ্রমে সয়তান আসিয়া জুমনকে কয়েদ করিয়া ফেলিল, প্রথমে মধ্যাহ্নকালিক তাসের আড্ডা, দ্বিতীয়ে সায়ংকালীন তবলের চাটী, তৃতীয়ে পরিদর্শকরূপে আড্ডায় সামান্য গতিবিধি—— এমন সতর্ক জুমনকে কয়েদ করিয়া ফেলিল ;—জুমন তখন স্ত্রীর অগোচরে আস্তে আস্তে দুচার বাজি জুয়ার খেলা খেলিতে আরম্ভ করিল। এত ধীরে তার খেলা চলিল যে জুমন সে ক্ষেত্রেও নিজের বুদ্ধি সাহায্যে অনেক সময় পাকা খেলোয়াড়কে হারাইয়া দিয়া বাজি মারিতে লাগিল। জুমন ভাবিত সারাদিন বুকভাঙ্গা পরিশ্রম, কাজকর্ম্ম সারিয়া "মদভাঙ্গ" করার চাইতে এখানে আসিয়া একটু আমোদ করা তা মন্দই বা কি ? ইহাতে "আরাম ও অর্থ" দু'ই আছে, তবে হ্যাঁ বুদ্ধির কস্‌রত চাই ! এই বুদ্ধির কস্‌রত একটা ভয়ঙ্কর প্রলোভনের চিজ্‌। সংসারে দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক সাধুব্যক্তিও বুদ্ধির কস্‌রত দেখাইতে গিয়া মিথ্যা মামলা মোকদ্দমা করিয়া শেষটা সর্ব্বস্বান্ত হন। মিথ্যাকে

সত্যরূপে, অন্যায়কে ন্যায়রূপে এবং পাপকে পুণ্যরূপে খাড়া করিতে পটু একমাত্র সয়তানের ইঙ্গিত এই "বুদ্ধির কস্‌রত্‌!"—

জুমন তখনও স্ত্রীকে বুদ্ধির কস্‌রত্‌ দেখাইতে সাহস পায় নাই, গোপনে গোপনে তার খেলা চলিল, দেনা বাড়িয়া দোকান পাট নিলাম হইয়া গেল, স্ত্রীর কাণে সকল কথা উঠিল না, কিন্তু সাধ্বী সতী স্বামীর চিন্তা ও দেহভঙ্গ লক্ষ্য করিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া উঠিল; অর্থাভাবে যখন তার নিজের গহনার উপর স্বামীর নিষ্ঠুর হস্ত পতিত হইল, তখন তার কোন কথাই জানিতে বা বুঝিতে বাকী রহিল না। সে স্বামীকে অনেক প্রকার বুঝাইয়া, তিরস্কার করিয়া, পা ধরিয়া—দিন রাত্রি বারণ করিয়াও যখন স্বামীর নেশা ভাঙ্গইতে পারিল না, তখন একদিন রুমেলাকে তার কোলে ফেলিয়া দিয়া দুই চোখে সাত সমুদ্র বহাইয়া কত যে কাকুতি মিনতি, কাতর প্রার্থনা স্বামীর পায়ে ঢালিয়া দিল, তাহা অন্তর্য্যামীই বলিতে পারেন। শিশুকন্যা রুমেলা বা তার জুয়ানেশায় মত্ত পিতা সে কাতর প্রার্থনার একবিন্দুও অনুভব করিতে পারিল না। জননীর চোখে জল দেখিয়া রুমেলা মাত্র কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, আর জুমন? পৈশাচিক চীৎকারে সমস্ত ঘরটা স্তব্ধ করিয়া দিয়া স্ত্রীকে দূরে সরাইয়া জানোয়ারের মত গৃহত্যাগ করিয়া গেল। ক্রমে বাড়ীঘর গিয়াছে, এখন এই খোলার ঘর খানা মাত্র আশ্রয়।

(৩)

সব খোয়াইয়া জুমন এখন এক খোলার ঘর ভাড়া করিয়া সামান্যভাবে দিন যাপন করিতেছে। মান, সম্ভ্রম, বেশ ভূষা বা চলা ফেরার ভব্যতা একেবারে লোপ পাইয়াছে। শেষ সম্বল বাড়ীখানাও গিয়াছে। একে

একে জুমনের সকল অবলম্বন ভাঙ্গিয়া গেল, কিন্তু জুয়ার নেশা ভাঙ্গিল না। অর্থাভাবে পরিবার শুদ্ধ উপবাস করিয়াও জুমনের সেদিকে লক্ষ্য নাই, কিন্তু জুয়ার অর্থ আদায় না হইলে, সে পাগল হইয়া যায়। স্ত্রীর গহনা,ঘরের তৈজস একে একে সকল গিয়াছে। সামান্ত কিছু তৈজস ও পাকের মৃৎপাত্র, এখন এই আছে, আর আছে চায়ের সরঞ্জাম ; জুমন চা না খাইয়া থাকিতে পারিত না। ভাত না খাইয়া একদিন দুইদিন থাকা তার পক্ষে তেমন কষ্টকর হইত না, যেমন কষ্টকর হইত নিদ্রাভঙ্গের পর এক পেয়ালা চা না পাওয়া, আর সন্ধ্যার পর অন্ততঃ দু'বাজি জুয়া না খেলা। যদিও সেই অভাব আজও তার তেমন হইয়া উঠে নাই।

জুমনের এক শ্যালক ভবানীপুরে দরজীর কাজ করিত, ভগিনী ও ভাগিনেয়ীর শোচনীয় অন্ন বস্ত্রের কষ্ট সে সাধ্যানুসারে দূর করিবার চেষ্টা করিত। সে মাঝে মাঝে আসিয়া গোপনে ভগিনীর হাতে কিছু টাকা রাখিয়া যাইত, বেচারী তাই দিয়া কোনও মতে সংসার চালাইয়া লইত। স্বামীর ভয়ে একসঙ্গে কএকদিনের আন্দাজ ডা'ল চা'ল ইত্যাদি খরিদ করিয়া রাখিত। নগদ টাকা হাতে রাখিতে ভরসা পাইত না, ইতি মধ্যেও জুমন তার ব্যবহারের ক্ষুদ্র পেট্‌রাটী হাতরাইয়া দেখিয়াছে, যখন যাহা পাইয়াছে—সিকিটা, দুআনিটাও বাদ দেয় নাই, পকেটস্থ করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। স্ত্রী কি খাইবে, এত আদরের মেয়ে রুমেলার পেটে ভাত নাই, গায়ে জামা নাই, মুখে সে আনন্দ মধুর হাসি নাই—তার বা কি দশাটী হইবে, এসকল চিন্তা করিবার অবসর তার মোটেই ছিল না। সে যখন যাহা পাইত তাই নিয়া জুয়ার

আড্ডায় দাখিল করিত, কখন বা দুচার বাজি জিতিত, কখন বা হারিয়া যাইত। দুঃখের বিষয় জিতিয়াও জুমনের লাভ থাকিত না, তাহার বন্ধুগণ অতীতকালের বাকি হাওলাত পরিশোধের জন্য তাকে নিঃসম্বল করিয়া ছাড়িয়া দিত। জুমন বিষণ্ণচিত্তে গৃহে ফিরিত, কখন আহার করিত, কখন বা নাক ডাকাইয়া ঘুমাইয়া পড়িত, কদাচিৎ রুমেলাকে আদর করিয়া কোলে লইয়া তাহার সদ্যঃ প্রস্ফুটিত গোলাপের মত কচি মুখখানি চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়া দিত, জুমন হাসিতে হাসিতে কাঁদিয়া ফেলিত। কিন্তু স্ত্রীকে সে ধরা দিত না। তার স্ত্রী কতরকম যত্ন করিতে যাইত, খাইবার সময় কাছে বসিয়া কত কথা বলিতে চাহিত—অতীতের সুখ দুঃখ, বর্ত্তমানের রিক্ততা, ভবিষ্যতের অনিয়ত নয় সুনিয়ত পরিণাম স্মরণ করাইয়া দেখাইয়া এবং জাগাইয়া দিতে বেচারী কতরকম চেষ্টা করিত—সে যে কত কাতরতা দুটী চোখের সজল চাহনিতে ঢালিয়া দিয়া মর্ম্মের মর্ম্মস্থলটুকু বাহির করিয়া দেখাইয়া দিতে চাহিত; আগেকার দিনে হইলে যার একটী মাত্র নিশ্বাসে জুমন হৃদয়নিহিত সকল বেদনা অনুভব করিয়া কাতর হইয়া পড়িত, সেই জুমন আজ তার কতচেষ্টায় এতটুকুও বুঝিতে পারিল না, তার প্রাণ যেন ইহলোকের সকল সংবন্ধ সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া কোন সুদূর দেশের অজ্ঞাতবাসে চলিয়া গিয়াছে, এত হাসি কান্না সুখ দুঃখের বেদনাময় গার্হস্থ্যজীবনের সঙ্গে তার কোনদিন কোন সংবন্ধ ছিল বলিয়া তার স্ত্রীর অন্তরাত্মা ছাড়া আর কেহ সাক্ষ্য দিবার ছিল না। আর রুমেলা? সে এখন অনেকটা বড় হইয়াছে, কথা কহিতে চেষ্টা করে, তার আধ আধ ভাষা পিতাকে অজ্ঞাতে আকৃষ্ট

করে বটে, কিন্তু সে জুয়ারি সংসার বন্ধনে অনিচ্ছুক মুমুক্ষুর মত একটানে সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া সোয়াস্তির শ্বাস ত্যাগ কবিয়া পলাইয়া যায়। রুমেলার কচিবাহুদুটীর বন্ধনে কখনো বা বদ্ধ হইয়া তাহাকে আদর কবিয়া খাওয়া পরার কথা জিজ্ঞাসা করে।

স্ত্রীর শরীর শূন্য করিয়া গহনাগুলি সে কাড়িয়া লইয়াছে অনেকদিন। রুমেলার গায়ও কিছু গহনা ছিল, তার দাদুসাহেব, গলার হার, হাতের বালা, কোমরের বিছা গড়াইয়া দিয়া সুন্দরী নাতিনীকে আরও সুন্দর করিয়া সাজাইয়া ছিলেন। দারুণ অর্থকষ্টের দিনে যখন গৃহ একেবারে শূন্য, দেনা একেবারে বন্ধ, খেলার সময়ও ঘনাইয়া আসিত—জুমন রুমেলার গা ভরা গহনা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিত; কিযেন অজ্ঞাতভয়ে, দারুণ অবিশ্বাসে নিজেকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া পলাইয়া যাইত। রুমেলার গায় হাত দিতে সাহস করিত না।

(৪)

সেদিন জুমন এমন একটা নৃশংস কার্য্য করিয়াছিল যে, সেই লজ্জা, ঘৃণা, পরিতাপে তার অন্তরাত্মা একেবারে নির্জ্জীব নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল—কন্যার কাছে ও স্ত্রীর নিকট সে তেমন অপরাধী বলিয়া নিজেকে মনে করিতে পারে নাই, যেমন অপরাধী সে নিজের কাছে নিজেকে মনে করিতেছিল; তথাপি ভোরে আসিয়া কন্যার শয্যা পার্শ্বে শয়ন করিবার সময় স্ত্রী বা কন্যা কাহাকেও কোন কথা বলিতে সাহস পায় নাই, যন্ত্রচালিত পুতুলের মত সোজা সটান গৃহে প্রবেশ করিয়া, কোনদিকে দৃকপাত না করিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। জুমন যদি সরলা স্ত্রী ও

পবিত্রতাময়ী কন্যার অপাপবিদ্ধ হৃদয়ের প্রতিবিম্ব স্বরূপ তাদের প্রসন্ন মুখের দিকে একবার মাত্র চাহিতে পারিত—তাদের অকৃত্রিম ভালবাসা, অক্ষুব্ধ ক্ষমা এবং নিরুদ্বেগ সেবার একবিন্দু গ্রহণ করিতে সমর্থ হইত, তবে আজ তাকে এমন অপরাধীর মত নিজের ঘরে নিজের কারাবাস যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইত না;—সেই সকল স্বর্গীয় স্নেহমমতার অমৃতস্পর্শে আসিতে পারিলে তার সকল পাপ সকল গ্লানি এতদিনে ধুইয়া যাইত। পবিত্র প্রেম ও স্নেহের প্রভাব জুমনের অবিদিত ছিল না, সে তার চির ক্ষমাময়ী স্ত্রীকে জানিত, কন্যাকেও চিনিত তবু কেমন একটা সংকোচ, তাকে তাদের মধ্যে ধরা দিতে বিদ্রোহ করিত, সে পারিয়া উঠিত না, তবু তারা যতখানি ঘনাইয়া যাইত, হতভাগ্য ততখানিই সরিয়া দাঁড়াইত। সেদিন জুমন সারা প্রাতঃকাল হইতে বেলা ৩টা পর্য্যন্ত সহরের অলিগলি ঘুরিয়া কোথাও কিছু সংগ্রহ করিতে পারিল না। ঘরে সেদিন আহার্য্য ছিল না, কন্যা ও স্ত্রীর খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহের জন্য জুমনের সেই কঠোর জীবন সংগ্রাম নহে, অথবা নিজের আহার্য্যের জন্যও তার কিছুমাত্র আগ্রহ ছিলনা, সকালবেলা সেই নিত্যকার মামুলি একপেয়ালা চা সাবাড় করিয়া সে বাহির হইয়াছে, বাস্ আর চাই কি? হ্যাঁ চাই বৈকি? জুয়ারির জুয়ার পয়সা না হইলে কি চলে? পরিচিত অপরিচিত সুহৃৎ দুষমন্ ভালমন্দ অনেক লোকের কাছেই হাত পাতিয়া যখন সে একেবারে নিরাশ হইয়া পড়িল, তখন তার মনে কি এক আনন্দ জাগিয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি ঘরে আসিয়া রুমেলাকে ডাকিয়া কোলের কাছে টানিয়া আনিল, রুমেলা অনেকদিনের পর পিতার আদর পাইয়া একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল,

সে বলিতে লাগিল "বাবা ! মা এখনো কিছু খায়নি, আমিও কিছু খাইনি, তুমি কিছু খেয়েছ বাবা ?" জুমন কৃত্রিম কাতরতার অভিনয় করিয়া কহিল "না মা, অনেক চেষ্টা করেও খাবার কিছু আন্‌তে পারিনি, আজকে আর উপায় নাই।" রুমেলা কহিল "সে কি বাবা, তাহলে মা যে আমার বাঁচ্‌বেনা, তার জ্বর হয়েছে, তেষ্টায় ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছে, একটু মিশ্রী, খানিকটা সাবু, এ নাহলে মা যে বাঁচ্‌বেনা বাবা ! আমারও যা ক্ষিধে পেয়েছে তা আর কি বল্‌বো, কাল রাতও খাইনি বাবা !" বালিকা ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। জুমন তখন বালিকার করুণ ক্রন্দন-জড়িত স্ত্রীর রোগের বা তাহাদের ক্ষুধার কাহিন শুনিবার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। তার লোলুপ দৃষ্টি বালিকার গলার হার এবং হাতের বালার দিকে ছিল, সে কহিল "শোন্‌ রুমি, তোর হাতের বালাজোড়াটা দে, একজন ভদ্রলোকের কাছে বাঁধা রেখে আজকের মত খাবার দাবার নিয়ে আসি, অষুধ না আন্‌লেও ত হবে না, কোন চিন্তা নেই রুম্‌! আমি কাল্‌কেই বালাজোড়াটা খালাস করে এনে দেব।" রুমেলা ইতস্ততঃ করিয়া কহিল "চল মার কাছে যাই!" জুমন হাসিয়া কহিল "তাহলে কি তোর হাতের বালা নিতে দেবে ? ক্ষুধায় আমরা সবাই তখন মারা যাব, তোর যদি মাকে বাঁচাতে সাধ থাকেত, খুলে দে, কথা কইবার সময় নেই"—এই বলিয়া বালিকার কোনও সম্মতির প্রতীক্ষা না করিয়াই পিশাচ তার হাত হইতে জোরে টানিয়া বালাজোড়া খুলিয়া লইল, রুমেলা যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিল, তার মাতা অতিকষ্টে শয্যা হইতে উঠিয়া আসিতে আসিতে সে

জুয়ারি দুইলাফে সদর রাস্তায় পড়িয়া ছুটিয়া একেবারে আড্ডায় হাজির হইল। রুমেলার জননী মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

(৫)

রুমেলার মাতার জ্বর সারিল না, রুমেলা প্রতিদিন পিতার অপেক্ষায় পথের দিকে চাহিয়া থাকে, জুমন ইদানীং প্রায়ই ঘরে আসে না, সে কোথা কি অবস্থায় থাকে, তাহা জানিবার জন্য মা ও মেয়ে সর্ব্বদা ব্যাকুল, কিন্তু কেউ তাদের খাঁটি সংবাদ দিতে পারে না, বরং কেহ কেহ খুসিমত এক একটা সংবাদ গড়াইয়া তাদের কাছে কখনো কখনো বলিয়া যায়। কেহ বলে "হাঁ, জুমনকে দেখেছি বৈকি? রাস্তায় নেশা খেয়ে মাত্‌লামো কর্‌ছে দেখলাম।" কেহ বলে "ওগো শুধু তাই নয়, সেদিন দেখ্‌লাম ড্রেনে শুয়ে আছে, আহা সোণার কান্তি ছাই হয়ে গেছে।" কেহ বলে "না, জুমন আর ঘরে আস্‌বে না, সে পাগল হয়ে গেছে, সেদিন দেখ্‌লাম, পুলিসে ধরে নিয়ে গেল" ইত্যাদি, ইত্যাদি।—

এই সকল অপ্রিয় সংবাদে সরলা বালিকা ও তার স্নেহময়ী জননী একেবারে শিহরিয়া উঠে, তাহারা আহার নিদ্রা ছাড়িয়া কেবল জুমনের কথাই চিন্তা করে, জুমনের স্ত্রীর শরীরে এতটুকু শক্তি বা এতটুকু বল নাই, সে রাস্তায় বাহির হইবার মত শক্তিলাভ করিতে পারে নাই। তার ভাই কি একটা জ্বরের ঔষধ কিনিয়া দিয়া গিয়াছে, রুমেলা দিনরাত বার তিনেক তাই জোর করিয়া তার গলায় ঢালিয়া দেয় কিন্তু রাঁধিয়া ভাত দিবার মত বয়স তার হয় নাই, তবু সাবুটা বার্লিটা সে চালাইয়া দিতেছে।

ভাত? রুমেলার ভাগ্যেও জোটে না। এ বয়সে এতটুকু দরদ, এতটা সহানুভূতি, এত গাঢ় ভালবাসা কেবল ছেলেবেলা হইতে দুঃখ বেদনার মধ্য দিয়া বাড়িয়া আসিয়াছে বলিয়াই বোধ হয় তার হইয়াছে। নইলে একফোঁটা মেয়ে রুমেলা, সুখের সংসারে পড়িলে হয়ত দুচারিটা ভাল সাবান, জামা বা কেশ তৈলের সঙ্গেই পরিচিত হইত। সংসার তার মর্ম্মে মর্ম্মে এমন বেদনার কাঁটা বিঁধাইয়া দিয়া সুখদুঃখের, হাসিকান্নার, ভালমন্দর নিবিড় অনুভূতি জাগাইয়া রাখিত না। রুমেলা অতীত ও ভবিষ্যতের কৃষ্ণ যবনিকার মাঝখানে বর্ত্তমানকে তার বয়সের চেয়ে ঢের বেশী করিয়া বুঝিতে শিখিয়াছে। হায় দুঃখ! তোমার মত শিক্ষক সংসারে বিরল!

(৬)

রুমেলার মা বড় পীড়িত, আজ আর তার জীবনের আশা নাই, রুমেলার হাতখানি বুকের মাঝে চাপিয়া ধরিয়া সে কেবল কএকবার স্বামীর কথাই কহিতে চেষ্টা করিল, স্বামীর সঙ্গে তার শেষ দেখা হইল না। হায়! হায়! এমন অভাগিনী কেরে, পরপারে যাত্রা করিবার আগে একবার স্বামীর পায়ের ধূলা মাথায় লইতে পাবে না? রুমেলার মা চিরকাল মনে প্রাণে স্বামীর সেবা করিয়াছে, স্বামীর ভালর জন্য তিরস্কৃত হইয়াছে! শেষ জীবনে উপেক্ষিতও হইয়াছে, তা হোক্, কিন্তু আজ যে তার যাইবার দিন, সে যত দোষই করুক্, স্বামী যত নিষ্ঠুরই হোক্, আজ ওগো, এই জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে সে কথা কি কেউ মনে রাখিতে পারে? পতিব্রতার শ্বাসকষ্ট হইতেছিল—রুমেলা আর স্থির থাকিতে পারিল না। নিকটে

একটা ডাক্তারখানা ছিল, ডাক্তারকে আনিয়া তার মাকে একবার দেখাইলে হয়ত তার সকল যন্ত্রণা সারিয়া যাইবে, তাই মনে করিয়া কহিল "মা, আমি একটু আসি", মা কথা কহিতে চেষ্টা করিল কিন্তু সকল কথা প্রকাশ পাইল না, কেবল জলভরা দুটী চোখ কন্যার মুখের প্রতি নিবদ্ধ রহিল, সে চোখের নীবব ইঙ্গিতে রুমেলা বুঝিতে পারিল, সে কহিল "এখনি আস্‌ছি মা, আর যদি রাস্তায় বাবাকে পাই"—রুমেলা বেগে বাহিব হইয়া গেল।

*　　　　*　　　　*　　　　*

তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, কলিকাতার বড় বড় রাস্তা গাড়ী মোটর ও লোকজনে পরিপূর্ণ, ছোট গলিগুলিতে লোকজনের চলাফেরা কমিয়া গিয়াছে। রাস্তার সবগুলি আলো তখনও জ্বলে নাই, ছায়া ক্রমশঃ ঘনাইয়া আসিতেছে। রুমেলা ক'একপা অগ্রসর হইয়া হঠাৎ তার পিতাকে সাম্‌নে দেখিয়া চম্‌কিয়া দাঁড়াইল। সে তার জননীব মৃত্যুমলিন মুখ স্মরণ করিয়া উপস্থিত পিতার চিন্তাকঠোর মুখের দিকে তাকাইয়া সহসা কাঁদিয়া উঠিতে উঠিতে স্তব্ধ হইয়া পড়িল,যেন কোন অজ্ঞাত হস্ত তার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল, বালিকার তখনকার অবস্থা দেখিয়া জুমন চারিদিকে তাকাইয়া সত্যসত্যই তার গলা চাপিয়া ধরিল, রুমেলা পড়িয়া গেল। জুমন অতি ক্ষিপ্রহস্তে পকেট হইতে ছুরি বাহির করিয়া রুমেলার গলার হারটা কাটিয়া লইতে চেষ্টা করিল। রুমেলার কণ্ঠের শ্বাস তখন বন্ধ হইয়া আসিতেছিল, সে বলিতে চাহিয়াছিল "বাবা মেরোনা, মেরোনা" কিন্তু পারিল না! পিতার পৈশাচিক মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে বালিকা মূর্চ্ছিত

হইয়া পড়িল। পাষণ্ড জুয়ারি মেয়ের গলার হারটা কাটিয়া ছিঁড়িয়া যেমন পাড়িল লইয়া অন্ধকার পথে মিশিয়া পড়িল। রুমেলা মূর্চ্ছিত হইয়া রাস্তায় পড়িয়া রহিল এবং থাকিয়া থাকিয়া শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। তার ক্ষীণকণ্ঠের স্বর, অস্পষ্ট শব্দ যেন জুয়ারির অনুসরণে বার্থ হইয়াই সেই গলির মধ্যে আছাড় খাইয়া খাইয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল—"বাবা, বাবা! মেরো না, মেরো না।"

(৭)

রুমেলার মা অনেকটা সারিয়াছে, তার ভাই একটী বোন্‌কে সঙ্গে নিয়া এই কয়দিন এখানে থাকিয়াই ইহাদের সকল বিপদ, সকল বোঝা ঘাড়ে করিয়া বসিয়াছে; কিন্তু রুমেলার অবস্থা শোচনীয়। রুমেলা সেই যে নিষ্ঠুর দস্যুপিতার নির্ম্মম কণ্ঠনিষ্পেষণে, তার উগ্রভীষণমূর্ত্তির অস্বাভাবিক রক্তচক্ষু দর্শনে রাস্তায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল, আজ ৭ দিন যাইতেছে তার সেই মূর্চ্ছার অবসান হইতেছে না। সে থাকিয়া থাকিয়া "বাবা, বাবা, মেরোনা, মেরোনা," বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে। ইহা ছাড়া তার মুখে আর কোন শব্দ নাই। এই ৭ দিনে গলায় একবিন্দু জল ঢুকান যায় নাই। যখন সে চীৎকার করিয়া উঠে ঠিক সেই সময় তার 'দাঁতি' খুলিয়া যায়, আবার 'দাঁতি' লাগিয়া বেহুঁস হইয়া থাকে। তার মা কেবলই ভাবিতে থাকে, "হা খোদা, আমায় কেন মৃত্যুর মুখ হইতে টানিয়া আনিলে? আমি মরিয়া যাইতাম ভাল হইত, এ যাতনা আর যে দেখিতে পারি না খোদা!"—স্নেহময়ী জননীর অশ্রুধারা দুই গণ্ড বহিয়া পড়িত।

* * * * *

অনূঢ়ার পত্র।

একদিন প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোকে রুমেলার শয্যাখানি ভরিয়া গিয়াছে, বাহিরের দরজা ও জানালা সমস্ত খোলা, সহরের কোলাহল তখনও তেমন উগ্র হইয়া উঠে নাই। রুমেলার জননী কন্যার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া একখানি পাখা লইয়া বাতাস করিতেছে, সহসা রুমেলা চীৎকার করিয়া উঠিল, "উঃ! উঃ! বাবা, বাবা, মেরোনা, মেরোনা।" চীৎকারের শেষ শব্দগুলির সঙ্গে সঙ্গে একটা বুক ভাঙ্গা ধ্বনি ঘরখানি কাঁপাইয়া তুলিল, "আর তোমায় মারব না মা!"—সকলে দরজার দিকে চাহিয়া—দেখিল শৃঙ্খলাবদ্ধ পুলিশ প্রহরীবেষ্টিত হতভাগ্য জুমন। জুমন কহিতে লাগিল, "আর তোমায় মারব না মা, আমি তোমাদের অনেক মেরেছি, হাতে মেরেছি, ভাতে মেরেছি, জাতেও মার্ব্বো! উঃ, রুম্, রুমি, রুমেলা, বড় জ্বালা মা, বড় জ্বালায় শুধু তোমায় দেখতে ছুটে এসেছি; মা আমার, আমার পৈশাচিক মূর্ত্তি দেখে তুই মূর্চ্ছা গিয়েছিলি, আমি ভেবেছিলাম, তুই মরেছিস্, হা অভাগিনী সেও যে ভাল ছিল।" এই বলিয়া জুমন কন্যার শয্যার কোণে বসিয়া পড়িল। পুলিশগণ একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল রুমেলার মা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। জুমন চোখের জলে বুক ভাসাইয়া দিয়া গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে কহিতে লাগিল, "চিরদিনের জন্য মূর্চ্ছা যাও অভাগিনি, স্বামিহারা, কন্যা-হারা নারি, আর কেন? উঃ! রুম; রুমি, রুমেলা, আমি চল্লাম। দারোগা বাবু আপনারা তুচ্ছ অপরাধের জন্য আমায় গ্রেপ্তার করেছেন. আমার অপরাধ, আমার যথার্থ দোষ আপনারা কেউ জানেন না। অমি স্ত্রীহন্তা, কন্যাহন্তা দস্যু। যদি আমার অপরাধ শোনেন, শিউরে উঠবেন, প্রভাতের সূর্য্য চম্‌কে উঠবে, পৃথিবী ধ্বসে যাবে! আমি

কন্যাহত্যা—নানা স্ত্রীহত্যা—নানা হত্যার চেয়েও ভয়ঙ্কর—সহসা রুমেলা চীৎকার করিয়া উঠিল, "বাবা, বাবা, হার নাও গলা কেটোনা বাবা,—" জুমন আকাশ—কাঁপাইয়া চীৎকার করিয়া কহিল, "খোদা, খোদা, আমায় মার্জ্জনা কর্ব্বার মত দয়া—"সে আর কিছু বলিতে পারিল না, কন্যার বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দুই চোখের জলে তার বক্ষ ও শয্যা ভাসাইয়া দিল। পুলিশগণ একে অন্যের মুখের দিকে বিস্মিতনেত্রে চাহিয়া রহিল। ততক্ষণ রুমেলার জননী চৈতন্য লাভ করিয়া কোন মতে উঠিয়া আসিয়া স্বামীর পা দু'খানি জড়াইয়া ধরিল, সে কোন কথা কহিবার যোগ্য অবস্থার রাজ্যে তখন ছিলনা, সে কেবল ঊর্দ্ধনেত্রে খোদাতালার সিংহাসনের দিকে প্রাণের নীরব প্রার্থনাগুলি পৌছাইয়া দিতেছিল। তার প্রার্থনা শুধু এই,"খোদা, স্বামীকে আমার বাঁচাইয়া—দাও। আমার স্বামী যাই হন, আমার স্বামী, তাঁর পাপের শাস্তি কোটি কোটি জন্মে আমি নরকে পচিয়া পরিশোধ করিয়া দিব, তাঁর ললাটের পাপের দাগ, কলঙ্কের কালী, মুছিয়া দাও খোদা! আমি প্রাণ দেই খোদা, আমার প্রাণের বিনিময়ে তাঁর জীবন ভিক্ষা দাও—" রাস্তায় খঞ্জনী বাজাইয়া ভিখারী গাহিয়া যাইতেছিল, তার গানে খোদারই আশ্বাস বাণী শুনিয়া রুমেলার জননী কাণ পাতিয়া রহিল—প্রভাত-পবনের তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া সেই কণ্ঠ তার শ্রবণের পথে মরমে প্রবেশ করিল—

"যতই কেন হোকনা ভারি,
পাপের বোঝা বইবরে!
যতই কেন হোক্‌না দড়
পাপীর সাজা সইবরে!"

সমাপ্ত।